প্রেমতারা

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১২

শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্তকে

ভূমিকা

সার্কাসের মানুষের জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখতে সুরু করেছিলাম শুধু পটভূমিকার অভিনবত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে নয়। এরিণার চড়াবাতির পেছনে সার্কাসের মানুষের কঠোর পরিশ্রম, সাহস ও কলাকুশলের জীবনকে আমি শ্রদ্ধা করেছি। বিভিন্ন সার্কাসদলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। দেখেছি, ভারতের সার্কাসশিল্পীরা সবচেয়ে সুলভ মূল্যে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষকে আনন্দ দান করেন। কিন্তু তাঁদের ও সার্কাস-জগৎ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা স্বল্প। সার্কাসে শিল্পীর জীবনের বসন্ত-মৌশুম টুকু শুধু কাটে। তার পরে প্রায়শঃ তাঁরা অখ্যাত মৃত্যুর সম্মুখীন। তাঁদের জীবনে কোন নিরাপত্তা নেই। এমন কি জীবনবীমা-ও হয়না তাঁদের। মনে হয়েছে অন্যান্য ক্রীড়া-শিল্পীদের মতো সার্কাস শিল্পীরা-ও পরিচিতি ও খ্যাতি সম্মান নিরাপত্তার অধিকার রাখেন।

সার্কাসের মানুষের জাবন যতো রঙে রঙীন তত রঙ আমার কলমে নেই। এ উপন্যাসে যতটুকু পাঠকের ভাল লাগবে, সে প্রশংসা সার্কাসের মানুষের এবং অপ্রশংসা আমার অক্ষম লেখনীর।

১৩৬৫ সালে বসুধারা পত্রিকায় 'প্রেমতারা' উপন্যাস 'মনোহর ও প্রেমতারা, নামক প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুস্তকে প্রয়োজন বোধ কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করেছি।

যে সব সার্কাসের মানুষ পরিচয় দানে আমাকে ধন্য করেছেন তাঁদের এবং প্রকাশককে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

৩২-এ, পদ্মপুকুর রোড
কলিকাতা-২০

॥ ১ ॥

—ক্লাউন! ক্লাউন! ক্লাউন! ছুয়ো দিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল বস্তির ছেলেগুলো।

মানুষটাকে দেখলে সত্যিই হাসি পায়। মানুষের বিকৃতি মানুষকে যেমন কৌতুকের খোরাক যোগায়, এমনটি আর কিছুতে নয়। ক্লাউন, ক্লাউন, ক্লাউন!

মানুষটাকে দেখলে বয়স ঠাওর হয়না। পঁয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন—যে-কোনো একটা হতে পারে। কোথায় যেন থেমে গিয়েছে বয়সটা। মাথার চুল, ঘাড় আর জুলফিতে পাক ধরেছে অল্প অল্প। রোদে পোড়া তামাটে মুখখানা একদিন দেখতে কেমন ছিল, সে কথা তার বুড়ীর মুখের শত ব্যাখ্যানেও আজ আর বোঝা যাবেনা। কোনো নির্মম কৌতুকে কে যেন মুখখানাকে ধারালো আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। কপাল, নাক, একদিকের কান থেকে গলা অবধি চামড়া কুঁচকে রয়েছে আজও। যতটুকু অক্ষত রয়েছে, সেখানে চামড়া যেমন টান-টান, তেমনই চকচকে দেখতে। চামড়ার এতখানি লাবণ্য তার চেহারার সঙ্গে সত্যিই বেমানান। আর সবচেয়ে অসঙ্গত তার চোখদুটি। ঐ চোখ দেখেই নাকি—, ব'লে তার বুড়ী যখন গল্প ফেঁদে বসে তখন হেসে কাঁধে ভর দিয়ে লুটিয়ে পড়ে ধোপাবস্তির মেয়ে-ঝি'রা।

মনোহরের চোখে একদিন সে কি দেখেছিল, আজ তার রং-চড়ানো গল্পের শ্রোতারা সে রহস্যের হদিস কোনো কালেও পাবে না। অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও বলা চলে, চোখে তার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। মুখের একদিকটা যার মরা, কাঁধ থেকে ডান-হাতখানা যার বশে থাকে না—লটপট খায়, হাঁটবার সময় শরীরটাতে

যার অদ্ভুতভাবে ঝাঁকুনি লাগে—চোখছুটো তার আশ্চর্যরকম প্রাণবন্ত। যে-কোনো বালকের মতোই। বেঁটে ঝাঁকড়া ভুরুর নিচে কালো জ্বলজ্বলে চোখ-ছুটোতে একটা অফুরন্ত আদিম কৌতূহল। এ মানুষকে যেন মুখে কথা কইতে হয়না। চোখই তার হয়ে কথা কয়।

সকালবেলা কাঁধে বাজারের থলি নিয়ে পথে বেরোয় মনোহর। লাল, সাদা, কালো মোটা-মোটা ডোরা-কাটা বিচিত্র কোট আর গোড়ালির কাছে সুতো-ওঠা বিবর্ণ সবুজ প্যাণ্ট প'রে। তার এ পোশাক দেখছে চারবছর ধরে, তবু কালিয়ার দেশী কুকুরটা তীব্র প্রতিবাদে ডেকে ওঠে। ত্রস্ত, কুণ্ঠিত ও ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গীতে হাঁটতে থাকে মনোহর। কিন্তু পাড়ার ছেলেপিলে এই নিশানার অপেক্ষাতেই ওৎ পেতে ছিল। তারা গলির মোড়ে কাতার দিয়ে দাঁড়ায়। দেখে মনোহরও তাড়াতাড়ি হাঁটে। ডানহাতটা প্রয়োজনের চেয়ে বেশীই দোলে। পাশ কাটিয়ে যাবার সুযোগ সে কোনদিনও পায়না।

—ক্লাউন! ক্লাউন! ক্লাউন! কানে তোলেনা মনোহর। জোরে জোরে পা চালায়। ছেলেগুলো তার হাঁটার ভঙ্গী নকল ক'রে আগে পাছে চলে। বক দেখিয়ে ইতর শব্দ করে মুখে। আদিরসের ছড়া কাটে। তখন ক্ষেপে যায় মনোহর। দাঁড়িয়ে জন্তুর মতো নাক তুলে বিপক্ষকে কোন্ দিকে চেপে ধরবে ঠাওর করে নিয়ে তেড়ে যায়। রাগলে তাকে আরো অদ্ভুত দেখায়। যদি কাউকে ধরতে পারে, মেরে বসে আস্তে ছু-ঘা।

পরে বাজার-ফিরতি মনোহর যখন দোকানে বসে, তখন ছেলেদের মা-বোন-পিসীরা এসে বুড়োকে গালি দিয়ে যায়। বুড়ী বুড়োর হয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে। আবার দোকানে এসে বুড়োকেও শাসায়। বলে,

—কেন গো, ঐ জামাটি পরবার তোমার কোন্ দরকার? তোমার জন্যে কি পাড়ায় আমি বিবাদ করবো?

চোখ পিটপিট করে বুড়ো। অস্পষ্ট জবাব দেয়। পরে বুড়ী সরে গেলে বয়াম থেকে মুড়ি লজেন্স নিয়ে সকালের অপরাধী দলের কারুকে দেখলে কুণ্ঠিত হেসে হাতে গুঁজে দেয়। আপোস হ'লে পরে দাঁড়ায় ছেলেগুলো। চোখে চোখে ইঙ্গিত করে নিজেদের মধ্যে। মনোহরকে বলে,

—বুড়োর শুধু গাঁজাখুরি কথা। বাঘ খেলাতে তুমি? ঐ বুড়ো হাড়ে?

মনোহর বোঝে এ হলো গল্প সুরু করবার ধর্তাই। বুঝে চোখ মিটমিট করে। ভাবখানা এই—বড় চালাক তোমরা। তোমাদের চালাকি আমি বুঝেছি। ছেলেগুলোও নাছোড়বান্দা। বলে, বাঘের খেলা দেখবি তো হাওড়া-সার্কাসে যা। কী খেলায় মেয়েটা! কোথায় লাগে তার কাছে···

এসব কথা বললেই যে তেতে উঠবে মনোহর, তা নয়। তবে বেচাকেনা শিকেয় তুলে রেখে সে বিড়ি ধরায়। বলে, মিছে ক্যাঁও-ক্যাঁও করিস্ না। চেপে যা রে ছোঁড়ারা।

দম নিয়ে বলে, বাঘের খেলা তোরা কি দেখলি! ব্যাণ্ড বাজছে ঝমেঝম্—ঝমেঝম্—তাঁবুতে মানুষ—বাপ্‌রে মানুষের ভীড়! মাথায়-মাথায় কালো দেখা যাচ্ছে। সব নিশ্চুপ। ঢুকলাম যখন বাদশাকে নিয়ে আরে ব্বাপ্‌রে তার তেজ! এই ঘোড়ার মতো বাঘ। লাল-টকটকে বরণ—হাঁক যখন দিলে, ভয়ে নিশ্বাস পড়ে না মানুষের। তারপর—!

ব'লে এদিক ওদিক তাকায় মনোহর। বলে,—সার্কাস দেখাতে এয়েছে! যা শুধোস্‌গে হাওড়ার মানুষকে। হ্যাঁ, লড়াইয়ের বছর দেখিয়েছিল বাঘের খেলা গোপীমাস্টারের দল! মনোহরের নাম তারা জানে! মাস্টার বললো—মনোহর, বিগড়ে গেছে বাঘ। গুলি করে খতম করে দাও ম্যাজিস্ট্রেটকে ডেকে। আমি বললাম খবর্দার মাস্টার, জান দেবার এক্তিয়ার নেই তোমার—জানটি নিয়ে নেবে?

বিগড়ে গেছে জানোয়ার। গোপীমাস্টারকে ছাখে আর হাঁকার ছাড়ে। ভয়ে মাস্টারের হাত-পা কালিয়ে গেছে। সেই বাঘকে এক দাবড়ে ঠাণ্ডা করলাম—এক চাবুকে বাঘ চুপ'! এমন খেলা খেললে বাদশা যে, রংপুরের পুলিশ-সায়েব সেই নেউগী-সায়েব, এই অ্যাত্তো-বড়ো জোড়া গোঁফ—বাঘের মতো কুকুর পোষে—এক ধমকে যার জেলা ঠাণ্ডা—সে এসে আমাকে অমনি পঞ্চাশ টাকা বখশিশ করলে। বললে—সাবাস মনোহর, বাপ্‌কা বেটা তুমি! বাঙালীর মান রাখলে!

গল্পের খেই ভেঙে চটাপট শব্দ হয়। দোকানের ভেতর দিয়েই দোতলায় উঠেছে সিঁড়ি। বুড়ী নামে চটি-পায়ে। তোমার বাঘিনী আসছে গো!—ব'লে পালায় ছেলেগুলো। ছেলেগুলোকে গালি দিতে দিতেই নামে প্রেমতারা। বলে,—মা ঝি খাটছে, বাপ ঘানি টানছে, আর দামড়া ছোঁড়াগুলো বগল বাজিয়ে বেড়াচ্ছে! পুলিশে হুড়ো দিয়ে ধরে নে' যায় তো বেশ হয়। দিন রাত ক্যাঁচ-ম্যাচ!

মনোহরের দিকে কটাক্ষ করে বলে,—আবার লজেন্সগুলো বিলিয়েছ? কেন? দাতব্য করতে বলেছি আমি তোমায়?

বুড়ো রাগ করতে জানে। বলে—

—বেশ তো, কাল থেকে তোমার দোকানে তুমিই বোসো গো প্রেমতারা। আমি তোমার হিসেব মাটি করিছি। লোকসান করিছি তোমার!

সামনে কেউ না থাকলে প্রেমতারাও বুড়োর রাগ ভাঙাতে জানে। বলে,—

—আমার লোসকান যে তোমারই লোসকান গো! তুমি আমি কি ভেন্ন?

এ কথায় বুড়ো বড় খুশি হয়। তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বলে,—

—আজ রাতে বসবি তবে বল্?

—তোমার শুধু ছোঁক-ছোঁকানি!

প্রেমতারার কণ্ঠে অকুণ্ঠ প্রশ্রয়; আহ্লাদে মনোহর একটু সুর ভাঁজে। বলে,—

—বিকেল-বিকেল এক-পো কিমা কিনে আনব। কেমন?

—হ্যাঁ, এই গরম তাতে আমি রাঁধতে বসে মরি আর কি!

—কেন রে, আমিই ভাজবো এখন। সেই বেশ ঝাল-ঝাল ক'রে?—পাঁাজ কেটে দিয়ে?

কিছু রহস্য, কিছুটা বা স্নেহ চোখে নিয়ে তাকিয়ে থাকে প্রেমতারা। বলে,—

—ছেলেগুলোর ওপর তুমি অমন ক'রে রাগ কোরো না। পাড়াটা ভালো নয়।

ছোট ছেলের মতো দোষের সাফাই দেয় মনোহর। বলে,—তা ওরা আমাকে ক্ষ্যাপায় কেন বল্?

—তুমি ঐ জামাটি না পরলেই পারো।

—তুই বলিস্ তো পরবো না।

প্রেমতারা চোখে-চোখে হাসে। বলে,—না পরলে যে মানায় না।

ছুজনেই হাসে। এসব কথা তাদের অনেকবার বলা-কওয়া হয়েছে। আজও তারা বলছে আর পরেও বলবে,—এমনিধারা একটা পারস্পরিক সমঝোতা প্রকাশ পায় তাদের হাসিতে।

পদ্মপুকুর পাক দিয়ে চওড়া রাস্তাটা হঠাৎ সরু হয়ে ঢুকে গিয়েছে পুবদিকে। এই জায়গাটুকু ধোপা-বস্তি। সাউথ-ক্যালকাটা ধোবি-খানার মক্কেলদের পট্টি। ধোপার ঘরে পয়সার অভাব নেই। তাই খোলার ঘরগুলো প্রায়ই দোতলা। ব্যাঙ্কশাল-কোর্টের ধুরন্ধর রায়-বাবু এই বস্তি থেকে মাসে-মাসে মোটা টাকা তোলেন।

পাঁচমিশেলী মানুষ নিয়ে গলিটা আশ্চর্যরকম জীবন্ত ভদ্রলোকদের প্রবেশাধিকার দেয়নি গলিটা। এখানকার বাসিন্দারা আর যাই হোক, জান্তবভাবে বাঁচতে জানে। কাঁচা পয়সা রোজগার করে

মেয়ে-পুরুষে। মোড়ের মাংসের দোকান থেকে তিনটাকা সেরের মাংস হরদম কিনে আঁচলে বেঁধে নিয়ে যায়। নতুন ছবি বেরুলে, বাচ্চা-কাচ্চা মেয়ে-পুরুষ ঝাঁক বেঁধে 'রূপালী' সিনেমায় গিয়ে বসে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে। বিয়ে-সাদিতে রাস্তার এদিক-ওদিক জুড়ে মিছিল বের করে। কাঁধে গ্যাসবাতি নিয়ে সার সার মানুষ যায়। লাল, কালো, সাদা, সোনালীর জমকালো পোশাক প'রে ব্যাণ্ডপার্টি আসে। মস্ত তুলোর হাঁস বা ময়ূরপঙ্খী নৌকোতে বর-বউ বসে। এমনধারা বিয়ে মাসে এখানে তিন-চারটে হয়। ছট্-পুজোয় ঠেলা-গাড়ির ওপর কলা, বাতাবি, শসা, বাতাসা পাহাড়ের মতো স্তূপ করে নিয়ে পয়সা ছড়াতে ছড়াতে কালীঘাটে যায় মেয়েরা রামসীতার গান গাইতে গাইতে। শেতলা-পুজোয় কালীঘাটের পটুয়াপটিতে অর্ডার যায়। দশহাত আড়ে-লম্বায় প্রতিমা আসে। বারোয়ারী চাঁদায় নমো-নমো ক'রে পুজো সেরে মাকে সন্তুষ্ট করবার ভারটা বুড়ীদের ওপর ছেড়ে দিয়ে মাতব্বররা মৌজে ব'সে যায়। রংটা যখন বেশ ভালো চড়ে তখন—সোহাগীর বাপ মেয়েকে শ্বশুরঘরে পাঠায় না কেন, অথবা সেন-বাড়ির মেয়েকে কে চিঠি-চালাচালি করতে দেখেছে পার্কে—এইসব কথা থেকেই গালাগালি হৈ-হল্লা লেগে যায়। সোডার বোতলও ছুটে যায় ছুটো-একটা। পাড়ার পাশেই পুলিশ-ফাঁড়ি। সুতরাং বেশীদূর গড়ায় না হাঙ্গামা। আলাপ-আলোচনা যা হবে তা বন্ধুজনের মতো। মারচোট নিয়ে মুলাকাতে ছুই-পক্ষেরই আপত্তি। আবার কখনো কখনো ট্রাইসোকোটোর তারে হিন্দী গজলগানের মাধ্যমে কথা কয়ে ওঠে বিবরবাসী ক্ষিদে। এ ক্ষিদের বাসা মনে। এর জানান্ শরীর-মনের চন্‌মনানিতে। যখন অস্থির হয়ে ওঠে কলিজার রক্ত, তখন কখনো মাঝরাতে গানের কলি ছুটে যায় আঁধারে—

গমে দিল্ তুঝ্‌কো দিয়া
গমে দিল্ তুঝ্‌কো দিয়া···

অন্ধকার রাস্তায় পা ঘষটে-ঘষটে বাড়ি ফেরে কোনো বেসামাল বাস ড্রাইভার।

ক্ষিদে-তেষ্টা স্নেহ-ভালবাসা প্রেম-হিংসা-বাৎসল্য নীচতা-শঠতা এইসব জান্তব-বৃত্তিগুলো মেনে-মেনে যে-সব মানুষ বাঁচে, তারা হয়তো এইসব গানের ভেতরে অন্যান্য কথা শুনতে পায়। যাদের কান নেই তাদের কাছে এ একান্তই চুটকি ও সস্তা। প্রাণ পায়না তারা এতে।

ধোপা-বস্তির মাঝামাঝি জায়গায় ঠিক বাঁকের মুখটায় মনোহর আর প্রেমতারার ঘর। খোলার দোতলায় একখানা বড় ঘরে থাকে ওরা। বারান্দায় টিনের আড়ালে রান্নার জায়গা। জলচৌকিতে বাসন-কোসন, ঘরে খাট-আলনা, দাঁড়ে ময়না, কোণায় পুরোনো গ্রামোফোন—সাজসাজন্ত সংসার বেঁধেছে প্রেমতারা। দেয়ালে টাঙানো একখানা পুরোনো জাপানী মাদুরে কিমোনো-পরা পাখা-হাতে জাপানী মেয়ের ছবিখানা ফিকে হয়ে এসেছে। টিনের রং-চটা তোরঙ্গে ক'টা রং-চটা পুরোনো সাটিন-সিল্কের পোশাক আর রুপোর মেডেলও পুরোনো—দেখলেই বোঝা যায়। নতুন-পুরোনো অনেক-গুলো ক্যালেণ্ডারের ছবিতে দেওয়ালের ফুটো-ফাটা বন্ধ। ছোট ছোট জানলা দুটো পুরোনো লুঙ্গির কাপড়ের পর্দায় ঢাকা। মুক্ষী-পায়রার মতো গেরমানি করে বাঁচে এখানে প্রেমতারা। এত ঢং-রং তারই সাজে। নইলে এ-পাড়ার মানুষের জীবনে এত আব্রু নেই। যা আছে খোলামেলা। জানা-জান্তি।

পাড়ার মানুষ খাতির করে চলে প্রেমতারাকে। বলে—ওরে ব্বাপ্‌রে! বড় শান্ মেয়েমানুষ!

সে কথা সাজে। বড় ধার প্রেমতারার চোখে মুখে, কথায়। বয়স কোন্-না পঁয়তাল্লিশ হবে, একদিনের কটা রঙে এতদিনে মেচেতা পড়েছে। জিরি-জিরি কোঁকড়ানো চুলের চেরা সিঁথিতে পরিপাটি বড়ির মতো নুটি-খোঁপা। আর্ট-সিল্কের সস্তা ছাপের কাপড়

কুঁচিয়ে পরা, পায়ে চটি—প্রেমতারা যেন মহারানী। নীল চোখে আজও বিজলী-ঝিলিক। দরকারমতো দু-দশটা বাঘা পুরুষকে দাব্‌ড়ে সায়েস্তা করবার যোগ্যতা রাখে প্রেমতারা।

মনোহর নয়, প্রেমতারাই হালটি ধরে আছে সংসারের। যে হাতে ধরে আছে, সে যে কতখানি দড়ো হাত—যার অভিজ্ঞতা আছে, সেই জানে এ তল্লাটে।

নিচের তলায় মনোহারী দোকানটা একান্তই বুড়োকে সারাদিন একটা কাজ ধরিয়ে বসিয়ে রাখবার জন্যে। পাড়ার মানুষই শুধু নয়, মনোহর নিজেও যেন সেই ভাবনার ভাবুনে। যেন এ দোকান তার তেমন করে না চালালেও হয়। যেন অনেক-কিছু আছে প্রেমতারার। এ দোকানে বসে খেলাচ্ছলে কিছু গাফিলতি যদি করেই মনোহর, তাতেও কোনো দোষ হবে না। এই ভাবটা ঠিক দেখতে পারেনা প্রেমতারা। যখন যেটি করবে, সেটি বিচক্ষণভাবে না চালাতে পারলে তার রাগ হয়ে যায়। খাতা-পেন্সিল-লজেন্স-বিস্কুট ডাল চিনি গুলিসুতো সাবান ধূপকাটি আর চায়ের-পাতা-প্যাকেটের এ দোকানটা থেকেও মাসে মাসে অন্ততঃ একশো টাকা তুলতে চায় প্রেমতারা। বলে—

—দাতব্য তো খুলিনি ? ধার দোব কেন ?

বাকি রেখে জিনিস দেওয়া নিয়ে এক এক দিন তুমুল কাণ্ড বাধে। বুড়ো যত চ্যাঁচায়, বুড়ীর সরু তীক্ষ্ণ গলা তার তিনগুণ ওপরে যায়। কুৎসিত গালিগালাজ বিনিময় হয়। তার পর বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে প্রেমতারা। রান্না-ভাতে জল ঢেলে দেয়। ক্ষিদে মোটে সইতে পারে না মনোহর। তাই বেলা হলে সে-ই অপারগ হয়ে মান ভাঙায়। ফোঁস-ফোঁস করে প্রেমতারা আর ঝাম্‌টা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেয়। বলে—

—আজ আমি ঢেপ্‌সী, বুড়ী ধুম্‌সী—কুঁড়ের বস্তা হইছি! আমার আর কদর নেই, না ?

হাজার বার ঘাট মানে মনোহর। নাক-কান মলে, মাপ চায়। অনেকগুলো হলফ করে। তখন প্রেমতারা উঠে এসে খেতে বসে। খাওয়া-দাওয়া হলেও মুখের মেঘ কাটে না। পান খেতে খৃস্টান দাই-বাড়ি যায় প্রেমতারা। বলে—

—ও আমার কি বিয়ে করা স্বামী যে এত কথা শুনব আমি? আমার মতো মানুষ ছিল বলেই না ত'রে গেল মিন্‌সে?

প্রেমতারার কাছে টাকা ধারে না এমন মানুষ কেউই নেই এ তল্লাটে। সায় দেয় খৃস্টান বুড়ী। বলে,—সে কথা আমরা তো বলি-ই। তোমার মতো মানুষ দিদি—

এ কথার মুখে-মুখে মনোহরের নিন্দে যদি উঠেই পড়ে, সে সহ্য হবে না প্রেমতারার। তাই সে অন্য অনেক কথার মুখ বন্ধ ক'রে বলে—

—কি করবো বল ভাই, সাধ ক'রে কাজল পরিছি, এখন কালি বেরুলেও কিছু বলা চলবে না।

এমন ঝগড়া অনেক হয়। অনেক মেটে-ও। কোন্ দিক টেনে কথা কইলে সুবিধে হয়, পাড়া-প্রতিবেশী তার কূল-কিনারা পায় না।

বিকেল নাগাদ দেখা যায়, চুল আঁচড়ে ভব্য-সভ্য হ'য়ে সাদা জিনের প্যাণ্ট আর গলাবন্ধ কোট প'রে জুতো পায়ে চলেছে মনোহর। পাশে পাশে প্রেমতারা চলেছে রঙীন মাদ্রাজী কাপড় প'রে—পাউডার মেখে, খোঁপা বেঁধে। দুজনে এমনভাবে গল্প করতে করতে চলেছে যে, দেখলে কেউ মনেও করবে না তিনঘণ্টা আগে একজন আর-একজনকে খুন ক'রে ফাঁসি যেতেও অরাজী ছিল না। এখন তাদের বড্ড ভাব। এখন আর মনোহরকে কেউ ক্ষ্যাপায় না। ক্লাউন ব'লে ডাকে না। প্রেমতারাকে সমীহ ক'রে সবাই চুপ ক'রে থাকে। প্রেমতারা বলে—

—ঐ কোটটা না পরলেই পারো। কই, এখন তো কেউ কিছু বলছে না?

মনোহর আর প্রেমতারা ট্রামে চড়ে বেড়াতে যায়। প্রায়দিনই গড়ের মাঠে গিয়ে ব'সে থাকে। বাদাম-ভাজা, ফুচ্‌কা, আলুকাবলী খায়। কোনদিন বলে—

—চল গো, 'ভিক্টোরিয়া' যাই।

এত জায়গায় যায় তারা, কখনো ভুলেও চিড়িয়াখানা যায় না। খাঁচায় বাঁধা পশুপাখী দেখতে তাদের ভালো লাগে না। খাঁচার বাঁধনে বন্দী বাঘ সিংহের ডাক—তাদের পাড়ায়ও শোনা যায় মাঝরাতে। কখনো ঘুমের ঘোরে সে ডাক শুনলে মনোহর হাতের ঝাপট মেরে ডাকটা না শোনবার চেষ্টা করে। কিন্তু মাঝরাতের নিষুত ছাড়া যে জানোয়ার ডাকে না, তার ডাকের জোর আছে। সে ডাক মনোহরের কানে পৌঁছবেই পৌঁছবে। সে ডাক শুনলে এখনো মনোহর চন্‌মন্‌ ক'রে জেগে ওঠে। ভালো লাগে না তার। মাথাটা গুঁজে দেয় সে প্রেমতারার কাঁধে। শিশুর মতোই সান্ত্বনা চায়। ও ডাক শুনতে চায় না মনোহর। ও ডাক সে চেনে, জানে, বোঝে। অনেক-দিন আগে খোলা জঙ্গলে থাকতো অরণ্যচারী—রাতের বোঁদে বেরিয়ে ডাকতো সঙ্গিনীকে। আবার কখনো গম্ভীর গর্জনে জানান্‌ দিত নিজের অস্তিত্ব। এখন সে-জীবন ভুলে গিয়েছে তারা। তবু মাঝরাতের নিষুত আঁধারে গাছপালা-ধোওয়া ঠাণ্ডা বাতাস নাক ভরে টানতে টানতে আজও তারা ডেকে ওঠে। এ হলো অভ্যাসের ডাক। এতে কোনো কথা নেই। কোনো বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ নেই। খাঁচার বাঁধন অসহ্য হয়েছে বলেই যে তারা ডাকছে তা নয়। এমনি করে তারা ডাকতো অনেকদিন আগে। তাদের শৈশবে। কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানাইকা—সুন্দরবন, মধ্যপ্রদেশ বা গাড়োয়াল অঞ্চলের কথা আজ তাদের আফিমের মৌতাতী মনের কোন্‌ তলায় তলিয়ে গিয়েছে। কপিশ চোখে যদি কিছু থাকে তো সে-ভাষা কোনদিনও বুঝবে না মানুষ। এখন তারা ডাকে পুরোনো অভ্যাসের বশে। এ ডাক শুনে ছটফট না করলেও পারে মনোহর। তবু তার

কেমন-কেমন লাগে। আবার এক এক দিন জানলার ধারে বসে কান পেতে শোনেও মনোহর। শুনতে-শুনতে ঘুম চলে যায়। চুপ ক'রে ব'সেই থাকে মনোহর—আর খাঁচার বাঘের ডাক শোনে কান পেতে।

দোকান যে একেবারেই শখের জিনিস প্রেমতারার এ কথা বললেই চটে যাবে সে। যে বলবে, তাকে গালি দেবে নয়তো সেধে ঝগড়া করতে বসবে বুড়োর সঙ্গে। তবু এ-কথা নেহাতই দুষ্টু-লোকের রটনা নয়। অনেক যোগ্যতা রাখে প্রেমতারা। নিজের ওপর তার কম ভরসা নেই।

রাত এগারোটা সাড়ে-এগারোটায় যখন পথঘাট নিষুত হয়ে আসে তখন হাতের বিড়ি রাস্তায় ফেলে জুতো ঘষটে নিভিয়ে, ছায়ার মতো সাঁৎ করে ঢুকে যায় মানুষ মনোহরের দোকান-ঘরে। জুতো খুলে রেখে উঠে যায় দোতলায়। সিঁড়ি মচমচ করলে চটে যায় প্রেমতারা।

ওপরের ঘরে মেঝেতে সতরঞ্চি বিছিয়ে, ঢাকা-দেওয়া লণ্ঠন বসিয়ে যা চলে—আইনের চোখে তা নিষিদ্ধ। তিন-তাসের ম্যাজিক জানে প্রেমতারা। একটাকা-দেড়টাকার বাজি থেকেই ফি-রাতে তার পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ টাকা কামাই। মরশুমে বেশীও ওঠে। স্ফূর্তি-পান খায় প্রেমতারা, আর তীক্ষ্ণ চোখে ত্মাখে কোনো ফন্দিবাজি হলো কিনা। বাজি হেরে পয়সা না দিয়ে উঠে পড়লে কোনও সাঙাতকেই পরোয়া করে না প্রেমতারা। ফাঁকি দিতে চায় যে মানুষ, সে কলার তুলে দিয়ে উঠে পড়ে। কিন্তু প্রেমতারার চোখকে এড়ানো সোজা নয়। সেতাব, বিদেশী, বড়্‌কা এরা প্রেমতারার হয়ে কলার চেপে বসিয়ে দেয়। বলে—

—আপনার ভুল হয়ে যাচ্ছে দাদা!

ভাগ্যি এই যে এমন ভুল বেশীজন করে না। এখন বাছাই-করা মানুষকে অনেক খোঁজ-তল্লাসী নিয়ে তবে ঢুকতে দেয় প্রেমতারা।

চুনাপট্টির গলিতে পাঁচবছর আগে বড় হৈ-হাঙ্গামা হয়েছিল। দেশী মদের কারবারী শুকলাল সা প্রেমতারাকে পেঁচিয়ে ফেলবার জন্যে রসিয়াকে পাঠিয়েছিল। রসিয়া কোনরকম গুণ্ডামি করবার অনেক আগেই হাল্লা তুললো ভকত। তাকে ঠকিয়েছে রসিয়া। সতেরো টাকা স্রেফ ডবল-নওলা দেখিয়ে নিয়েছে। চ্যাঁচামেচি হৈ-হাঙ্গামা থেকে ছোরা সেঁদিয়ে গেল রসিয়ার বাঁ কব্জিতে। পুলিশকে খবর দেবার তালে ছিল শুকলাল। অবস্থা দেখে সেও ঘাবড়ে গেল। সে হাল্লার জেরে বাসা উঠিয়ে দিতে হলো প্রেমতারাকে। ডাইস-বোর্ড সেই থেকে আর পাতেনি প্রেমতারা। মানুষ এনেছে বাছাই ক'রে। বাজি ধরবার নেশা এসব মানুষের রক্তে। নেশার কোনো জাত-বিচার নেই। সে কথা প্রেমতারাই চমৎকার বলে। এমন ক'রে বলে—যেন এ একটা মস্ত জীবন-দর্শন। অনেক অভিজ্ঞতার ফলে যেন এই গভীর তত্ত্ব জেনেছে সে। বলে—

—আমি তো পাপ করছি না গো—ব্যবসা করছি।

মনোহর বলে,—ঐ তিন-তাসই তোকে ডোবাবে জানলি ? জুয়ো খেলাস্ তুই—!

প্রেমতারা তখন আস্তে আস্তে ভালো কথায় এই দর্শনের ব্যাখ্যান করে। বলে—

—নেশাটি কি আমি ধরিয়েছি ? নেশা যে মানুষের রক্তে গো ! এক এক জনের এক এক নেশা। দেখনি তুমি ঘোড়ার নেশায়, মদের নেশায় মানুষ কম পয়সা খোয়া দিচ্ছে ? এই পয়সা মানুষ খরচ করবেই করবে। তা আমি ব্যবসা ক'রে দু'পয়সা নিলে অধর্ম হলো ? এই পয়সাটি যে ওরা অন্য জায়গায় খুইয়ে আসবে। আমার কাছ থেকে বরং সময়ে অসময়ে দুটো টাকা ধারও পায়। বলো, যা ন্যায্য তাই নিই আমি। অধর্ম করি না। প্রেমতারার ধর্ম তার নিজের সুবিধেমতো ছাঁচে ঢালা। নেশা আছে যখন, তখন তাসের বাজিতে কয়টাকা খোয়া দিক্ মানুষ। সে তো যেচে ডাকছে না কারুকে।

তবে সুবিধাবাদী বলেই বাতিল করা চলবেনা প্রেমতারাকে। একটা জায়গায় তার আশ্চর্য ধর্মবোধ আছে। সতেরো টাকা খোয়া দিয়ে ভকত কিরকম হাউহাউ করে কেঁদেছিল বৌ-বাচ্চার নাম ক'রে, সে-কথা ভুলতে পারেনা প্রেমতারা। যার খোয়া দেবার মতো টাকা নেই,তাকে পারতপক্ষে ডাকে না সে। ঢুকতেই দেয় না। বৌ-বাচ্চার মুখ ভুলতে হপ্তার টাকা নিয়ে জুয়ার আড্ডায় ব'সে যারা ভাঁড়ে চুমুক দেয়—টাকাটা খোয়া গেলে তারাই সর্বনাশ দেখে সামনে। সেই বৌ-বাচ্চার নাম ধরেই শোকটা তাদের চাগিয়ে ওঠে। অনেক নীতির বালাই যার নেই, সেই প্রেমতারাই কোনো এক আশ্চর্য নীতিবোধ থেকে এই ধরনের ছা-পোষা মানুষগুলোকে বাতিল ক'রে দেয় তার লিস্ট থেকে। অবশ্য প্রত্যাখ্যানের ভাষাটা রূঢ়। কথাগুলো কঠোর। বলে—

—তিনপয়সার কারবারীর আবার জুয়ো খেলে বড়মানুষ হবার শখ! ঐ-যে বলে, কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় চুট্‌কি দিতে!

বের-ই করে দেয় না শুধু—দরকার হ'লে বাড়ি গিয়ে বৌ-কে কথা শুনিয়ে আসে। এমনিধারা মানুষ প্রেমতারা। পাড়ার মানুষ তার কূল পায় না। কালিয়া, ছেদীলাল, নহবৎকে যে হাসি-মস্করা ক'রে পান দিয়ে আপ্যায়ন ক'রে ঘরে বসায়—সে-ই যে কেন চরিত্‌রা আর ছবিলালের বেলায় এমন রূঢ় হয়ে ওঠে কে তার হদিশ করবে? মনোহর তখন বলে—

—তুই ভাগালি ব'লে কি ও ঘরের টাকা ঘরে নিয়ে যাবে?

—যে ভাগাড়ে ইচ্ছে যাক্‌না কেন। আমার চোখের সামনে তো নয়।

•

রোজগার একরকমে করেনা প্রেমতারা। তার আরো পন্থা আছে। বিশেষ বিশেষ দিনে যেদিন মদের দোকান বন্ধ থাকে,

অথবা রাত-গভীরে যখন কারুর দরকার পড়ে—হু'টাকার জায়গায় চারটাকা ফেললেই তোরঙ্গ খুলে বোতল বের করে দেয় প্রেমতারা। তার খদ্দের অনেকেই। ঝাড়গাঁও-এর ছোটবাড়ির বখাটে ছেলে পান্না থেকে স্থরু করে ডাক্তার-বাড়ির দরোয়ান পর্যন্ত সকলেই আসে প্রেমতারার ঘরে। ক্লাউনের কোট গায়ে দিয়ে মনোহর তখন আশ্চর্য ক্ষিপ্রগতিতে ওঠা-নামা করে। টাকা গুণে বাজিয়ে, আলোয় দেখে তবে তোরঙ্গ খোলে প্রেমতারা। মাঝে মাঝে রাত হুটো-আড়াইটেয় গাড়ি করে আসেন বাবুরা। প্রজাপতির মতো মেয়েদের রেশমী পোশাকের আভাস বোঝা যায়। চাপা গলায় হাসাহাসি হয়। গাড়ি থেকে ভেতরে টানা শিষ শোনা যায় চার বার। চারটে বোতল নিয়ে নেমে আসে মনোহর। একনিমিষে গাড়ির পেছনের লাল চোখ আঁধারে উধাও হয়ে যায় ভূতুড়ে ক্ষিপ্রতায়। গলির মোড়ে কন্‌স্টেবলের পায়ের মচমচ শব্দেও ভয় নেই প্রেমতারার। গোঁফ চুম্‌রে দোকান বরাবর এসে কন্‌স্টেবল দাঁড়ায়। তার বখরা হাতে গুঁজে দেয় মনোহর। সে চলে যায় টহল দিতে দিতে। আবার স্থন্‌সান্ নিশ্চুপ হয়ে যায় গলি। সমস্ত ভোঁ-ভাঁ। গ্যাসবাতির নিচে ঘুমোতে ঘুমোতে বোবা ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে কুকুরটা।

পাড়ার জীবনে তবু প্রেমতারা অপরিহার্য। অনেক জানে সে। বুদ্ধি আছে তার। সে শুধুই জীবন-সংগ্রাম করেনা। জিতে-জিতে বাঁচে। সে যে অনেকের চেয়ে দড়ো, তার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। পুরুষরাও তাকে স্বীকার করেছে। প্রেমতারার ছাড়-চিঠি সর্বত্র। শাশুড়ী-বৌয়ের বিরোধে সে মোড়া পেতে ব'সে কুশ্রী কলহ মিটিয়ে দেয়। আসন্নপ্রসবা মেয়ে-বৌদের 'শিশুমঙ্গলে' নিয়ে যায়। টিকিট করে দেখায়। নিজের ছেলেমেয়ে নেই। তবু অনেক জানে প্রেম-তারা। তার উপদেশে উপকৃত হয় মানুষ।

এ পাড়ার ঝিয়েরা মেয়েদের বিয়ে দিয়ে ঘর করতে দিতে চায় না। মেয়ে থাকলে তাদের রোজগার বাড়ে। শহর-বাজারের জীবন

জেনে মেয়েরাও দেশে-গাঁয়ে গিয়ে খালবিলে চুনো-পুঁটি ধরে—গোবর-চাপড়া দিয়ে সংসার চালাতে চায়না। শহরের ছেলেদের দেখে দেশ-গাঁয়ের হেটো-মেঠো মানুষে মন ওঠেনা তাদের। বাসিনী-কুসুম-বাতাসীদের মধ্যে ঘর-বর অপছন্দ হলো ব'লে ছেড়ে আসবার নজীর অজস্র। এসব ক্ষেত্রেও প্রেমতারা মাথা গলায় নিজের থেকেই বলে,—

—এখানে মেয়েকে খারাপ পথে হাঁটিয়ে পয়সা রোজগার করবি, এতবড় বুকের পাটা কেন তোর? বে দিইছিস্—ছেড়ে দে।

স্বচ্ছন্দে অভিসম্পাত দেয় প্রেমতারা। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে যখন, সুখেদুঃখে ঘর করুক। বলে,—

—বিয়েটা কি একটা যেমন-তেমন কথা! কতবড় ধর্মের বাঁধন বল্‌দিখিনি?

এই প্রেমতারাকেই অন্য সময়ে দেখা যায় মুক্ত প্রেমের সমর্থনে হয়-কে নয় করতে। ধোপার ছেলে বিরিজলাল আর ঝিয়ের মেয়ে কদমের ভাব হলো। বিয়ে নিয়ে দু'দলে মারামারি লাগে আর কি! তখন প্রেমতারাই বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করলো দুইপক্ষকে। দুইপক্ষ নারাজ দেখে, বিরিজকে ঘরে ডেকে নিয়ে বললে,—

—রেস্কা ক'রে ভাগিয়ে নিয়ে কালীঘাটে বে কর্‌গে যা! মনোমিল হ'য়েছে যখন, তখন ভয় পাস্ কেন? পুরুষ-বাচ্ছা না?

দরকার হ'লে নীলচোখে ঝিলিক দিয়ে হেসে আজও মাতিয়ে দিতে পারে প্রেমতারা। বিরিজ বললো,—হিম্মতের কথা বলছো মাসি?

রিক্সা নয়—বন্ধু নহবতের ট্যাক্সি চ'ড়ে বিয়ে করে এলো বিরিজ। শেষ অবধি তার মা সেই বৌ-ই বরণ করে তুললো ঘরে, আর মনের খুশিতে পুরোনো গ্রামোফোনে ক্যান্‌কেনে গলার রেকর্ড বাজাতে বসলো প্রেমতারা আর মনোহর: কে নিবি ফুল!—কে নিবি ফুল!...

টাকায় দু'পয়সা হারে সুদ নিয়ে টাকা ধার দেয় প্রেমতারা। শোধ দিতে দেরী হ'লে গালি দিতে যায়। আবার মেয়ে-বৌদের দুপুরের আসরে বসে আদিরস বা ভূত-প্রেতের রসালো গল্পও সে ফাঁদতে জানে। অনেক দূরপাল্লা নেয় প্রেমতারা। অনেক রকম দোষে গুণে মানুষ সে। আশ্চর্য কি যে পাড়ার মানুষ তার কূল পায় না! তা ছাড়া এই বয়সেও যার কাপড়ে চুলে চটিতে এমন পরিপাটি —সে-মেয়েমানুষের কিনারা পাবে কে?

সকলের কাছে দুর্বোধ্য যে-প্রেমতারা, একজনের কাছে সে জলের মতো সহজ। মনোহরকে সে সত্যিই ভালবাসে। ভালবাসাও তার নিজস্ব চরিত্রের ঢঙে প্রকাশ পায়। সেধে ঝগড়া করে। সেধে মানিনী হয়। আবার অন্য সময় শুধুই মায়া-মমতা দেখায়। তার কারণেই একদিন আফিম ধরেছিল মনোহর। সরকারী কণ্ট্রোলের দুধ এনে আজও প্রেমতারা তাকে ক্ষীর করে দেয়।

বিকেলে মনোহরের সঙ্গে বেরুনো, সেও তার একটা প্রয়োজনীয় বিলাস। এটুকু নাকি তার চাই-ই।

মনোহরের স্বভাবে বৈচিত্র্য নেই। রাগ হ'লে সে সবটুকু নিয়ে ক্ষেপে ওঠে। দুঃখ হ'লে গোটা মানুষটার চোখ-মুখ নাক-কান সবই যেন কুঁকড়ে যায়। প্রেমতারার প্রতি তার একনিষ্ঠ আনুগত্য। সে আনুগত্য আবার বেড়াতে বেরুবার সময় যেমন প্রকাশ পায়, এমনটি আর কখনো নয়। প্রেমতারা সেজেগুজে মেজাজে হাঁটে। মনোহর পাল্লা নিয়ে তুর-তুর করে চলে। তার হাঁটা চলা এমন যে, ধীরে হাঁটলেও মনে হয়, জীবজন্তুর মতো দুল্‌কি চালে যাচ্ছে।

কাঠের হাতল-লাগানো ছাপা কাপড়ের ব্যাগ ভ'রে প্রেমতারা আর মনোহর তরকারি মাংস পেঁয়াজ চা চিনি কেনে। রান্নাবান্নার কথা তুলতেই প্রেমতারা অবশ্য গরম তাতের কথা বলে ঝামটা দিয়েছিল, তবু কার্যকালে দেখা যায় বুড়োকে সরিয়ে সে-ই বসেছে স্টোভ জ্বেলে। পুরোনো স্টোভে পাম্প দিতে দেয় না বুড়োকে। বলে,—

—একে খুঁতো মানুষ, তাতে পুড়ে মরবে যে!

চাকির ওপর পেঁয়াজ আর ধনেপাতা কুচোতে কুচোতে মনোহর বলে,—

—তুই পুড়লে আমার সইবে?

—সইবে না?

আনন্দ হ'লে গলাটা ভেঙে কথাগুলো আধখানা হয়ে সিকিখানা হয়ে অদ্ভুতভাবে লাট খায় মনোহরের মুখে। বলে,—

—তুই ঝাই বলিস-না কেন, তোর কষ্ট আমার এতটুকু সয় না। জানলি?

অ্যালুমিনিয়মের কালি-মাখা কড়া চাপিয়ে মাংসের বড়া ভাজে প্রেমতারা। চোখ ছোট ক'রে সাইজ দেখে। তার পর বলে,—

—তবু তো বে হয়নি।

—কে বললে?

মনোহরের গলা এখন চমৎকার। সে এখন কথায়-বার্তায় অনেক প্রশ্রয় চাইছে। কার্পণ্য করেনা প্রেমতারা। অল্প অল্প হাসে। বলে,—

—বেশ কেটে গেল, তাই নয় গো?

—আমার কি মনে হয় জানিস? এতটুকু বয়স হয়নি আমার। সত্যি বলছি। এই তোকে ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে বলছি।

—উঁ? বুড়ী হয়ে গেছি না?

ছোট খুকীর মতো আবদার-কাড়ানো গলা প্রেমতারার।

ছোট সতরঞ্চি পেতে বসে দুজনে। মাঝখানে থাকে বোতল গেলাস আর মাংসের ভাজাভুজি, পেঁয়াজ-কুঁচি। একটু একটু ঢেলে খায় মনোহর, আর চোখে তার মিঠে মিঠে কুয়াশা নামে। এখন এই মুহূর্তে, যে মানুষের চোখে এই বিগতযৌবন মানুষ দুটোকে কুৎসিত লাগবে—বিকৃত লাগবে, সে মানুষের দেখবার চোখ নেই। সে-চোখ যত সুন্দরই হোক না কেন, সে-চোখ দেখতে জানেনা।

কেননা এখন ছুজনের চোখে ছুজনকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। ছুজনের চোখ ছুজনাকে তারিফ করছে। .প্রেমতারার মুখের মেচেতা, চোখের নিচের ফোলা মাংস, মোটা ঠোঁটে পানের কষ কিছুই এখন দেখতে পাচ্ছে না মনোহর। সে দেখছে বিশবছরের প্রেমতারাকে। গোপী-মাস্টারের গ্রেট-জুবিলী-সার্কাসের সেরা মেয়ে প্রেমতারাকে সে দেখছে গোলাপী সাটিনের আঁটো পোশাকে, মাথায় জরির ছাতা ধ'রে তারের ওপর নাচতে। প্রত্যেকটা সুন্দর ভঙ্গিমার পর নিচু হয়ে অভিবাদন করছে প্রেমতারা। ধবধবে ফরসা মুখ। নীল চোখছুটি জ্বলজ্বল করছে। কোঁকড়া কোঁকড়া কটা চুলের বেঁটে বেণীতে চওড়া রিবনের ফুল। শুধু কি প্রেমতারা? সেই ঝলমলে আলো, গোপীমাস্টারের চওড়া বুকের ওপর ঝকঝকে মেডেলের সাজ সে স্পষ্ট দেখতে পায়। কানে শুনতে পায় ঝম্‌ঝমে ব্যাণ্ডের বাজনা। তারই মাঝখানে গম্ভীর গর্জন শুনতে পায় বাদশার গলায়। লোহার খাঁচায় অধীর হয়ে পায়চারি করছে বাদশা। পিঙ্গল দেহে কালো ডোরাগুলো চকচক করছে। তার পাশ দিয়ে ঘুরে যাবার সময়ে খরখরে জিভে হাত চেটে যাচ্ছে বাদশা। বাদশা অধীর হয়ে উঠেছে। এখনি খাঁচা খুলবে মনোহর। তার পর দৃপ্ত পায়ে ঢুকবে বাদশা।

আর প্রেমতারা? মনোহর যখন এত-কিছু দেখতে পায়, বিশ-বছরের ব্যবধান যখন তার মনে থাকেনা—তখন নেশা না করেও প্রেমতারার চোখে রঙ নামে। মনোহরের মুখের এই ক্ষত-বিক্ষত দাগ, পঙ্গুপ্রায় ডান হাতখানার অসহায় বিকৃতি, এসব সে দেখে না। সে দেখে পঁচিশ বছরের মনোহরকে। মাঝারি সুঠাম ছিপছিপে শরীর। শ্যামলা রঙের সুশ্রী চেহারা। ডাগর-ডাগর চোখে মাঠ-বনের মায়া। বুড়ো হাতী জঙ্গীর কপালে সাজ দিয়ে লাল টুকটুকে পোশাক পরে ঢুকছে মনোহর। —'হেই—ত্রো—ত্রো—স্‌ স্‌—লাম্‌!' —তার নির্দেশে শুঁড় তুলে সেলাম করছে জঙ্গী। তারপর লোহার বলের ওপর দাঁড়াচ্ছে।

ইলেক্‌ট্রিক চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে মনোহর। আগুনের রিঙের ভেতর দিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে বাদশা। দর্শকরা ঘন ঘন হাত-তালি দিচ্ছে। মনোহরের বুকখানা ফুলে ফুলে উঠছে।

মনোহর আর প্রেমতারা এখন সেই অতীতের সবটুকু জাঁকজমক দেখছে পরস্পরের মুখে। এই সবটুকু মিলিয়েই তাদের কাহিনী। এক প্রৌঢ় মানুষ, আর এক লুপ্ত-যৌবন স্ত্রীলোকের প্রেমের কথায় কারুকে হয়তো খুশি করা যাবে না। শুনতে বসলে ক্লান্তি বোধ হবে। কিন্তু এখানেই তো মনোহর আর প্রেমতারার জীবনের সুরু নয়। সমাপ্তিও নয়। এ তাদের জীবনের একটা অধ্যায় মাত্র। একদিন সে জীবন সুরু ক'রে আজ তারা মাঝপথে এসে পৌঁছেছে। মনোহর আর প্রেমতারাকে জানতে হলে সেই দিনে ফিরে যেতে হবে। সেই বিশ-বাইশ বছর আগেকার দুনিয়াতে। বিশ-বাইশ বছরের ব্যবধান। তবু সেই যুদ্ধের আগেকার দিনগুলো যেন এক-যুগ আগেকার কথা। একযুদ্ধের ধাক্কায় পৃথিবীটার বয়স একশো বছর এগিয়ে গেলো। দুনিয়ার পরিধি হলো ছোট। সেই দিন-গুলোকে তাই বোঝানো মুশকিল। আজকের দিনের কোনো বর্ণনা কোনো উপমাতেই সে-দিনটাকে তেমন করে বোঝানো যাবেনা।

দুঃখ-দারিদ্র্য, হতাশা, মৃত্যু—জীবন-সংগ্রামের এই অধ্যায়গুলির কোনোটাই সেদিনও অনুপস্থিত নয়। সবই ছিল, তবু তার বাইরেও যেন অন্য-কিছু ছিল। স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বেধে আণবিক-পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে চেয়ে তখনো পৃথিবী ভয়ত্রস্ত নয়। যে-কোনোদিন এই গ্রহ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে, এ বোধ ছিলনা ব'লে সেদিনের নির্বোধ নরনারীর মনে আজকের মতোই রোমান্স ছিল। পৃথিবীর অনেকাংশই অপরিচিত ছিল বাকিটুকুর কাছে।

সেদিনকার বঙ্গদেশ তখনো ভঙ্গ নয়। অবিভক্ত বাংলার দিন সেটা। দেশ বলতে যে-ছবিখানা মনে পড়তো—তাতে পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রেরও ঠাঁই ছিল। সন্দ্বীপ, হাতিয়া, আখাউড়া, চট্টগ্রাম,

বিক্রমপুর বা রাজসাহী এ নামগুলোকেও নিজের বলে ভাববার অধিকার ছিল। বিস্তৃতি বলতে বর্ষার পদ্মার ধূ-ধূ বুক, অথবা মাইলের পর মাইল ছড়ানো ধানক্ষেতকেই মনে পড়তো—যে ধান-ক্ষেতের ওপর দিয়ে বাতাসে পুজোর ঢাকের শব্দ বা জারিগানের ধুয়া ভেসে আসতো।

মহানগরীতে তখনো গ্যাসের বাতি জ্বলতো। পথের দু'পাশের বকুলগাছে ফুটতো অজস্র ফুল। জীবনযাত্রার গতি ছিল আরো ধীর-স্থির। আজকের তুলনায় একান্তই মন্দাক্রান্তা।

সেই দিন কালের যৌবন হচ্ছে মনোহর আর প্রেমতারার যৌবন। সেই সময় ধান-পাটের ফসল তুলে চাষীর হাতে যখন কিছু পয়সা হতো, বাংলার শহরে শহরে, গাঁয়ে মফস্বলে ঘুরে বেড়াতো গোপীমাস্টারের 'গ্রেট জুবিলি সার্কাস'। শহরের দেয়ালে দেয়ালে ভুল বানানে পোস্টার পড়তো। ঘোড়ার গাড়ি চড়ে বাজনা বাজিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করতো সাম্বো জাম্বো দুই ক্লাউন। সার্কাস-দলের পিছু পিছু ছোকরাগুলো চলতো। ঘোড়ার গাড়ির সহিসের সীটে ছেলেগুলো উঠতো, আর বকুনি খেতো। হাতি যাচ্ছে, উট যাচ্ছে, গড়গড়ে লোহার খাঁচায় যাচ্ছে বাঘ-সিংহ। গরুর গাড়িতে যাচ্ছে তাঁবু, দড়ি-দড়া, বাঁশ। চারপায়ে ঘুঙুর-বাঁধা সাদা টাট্টুর পিঠে বসে চলতো নীলনয়না সুন্দরী। হাসতো আর হ্যাণ্ডবিল ছড়াতো। মুগ্ধ দর্শক কাতার দিয়ে দাঁড়াতো। বলতো,

—কে যায়?···কে যায়?

—প্রেমতারা।

—প্রেমতারা?

—তারের উপর নাচে, বাঘের মুখে মুণ্ডু দেয়, দড়ির দোলায় ঝাঁপ খায়।

এ হলো সেইদিনের গল্প।

॥ ২ ॥

গ্রেট জুবিলী সার্কাসের সবটুকু কৃতিত্ব কিন্তু গোপীমাস্টারের নয়। বাঙালী শরীরচর্চায় পিছিয়ে পড়ে আছে, বাঙালী ভীরু এই অপবাদ ঘুচাবার জন্যে ষাট বছর আগে থেকেই উঠে পড়ে লেগেছিলো বাংলা-দেশের ছেলেরা। শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পথ দেখালেন—বাঙালীর সার্কাস গড়লেন—অনেকেরই মনে হলো এ একটা কাজ। করলেও হয়।

গোষ্ঠবাবু তাঁদেরই একজন। ভাঙাচোরা বিপ্লবী দলের কয়েকটি ছেলে নিয়ে বনহুগলিতে গড়লেন বেঙ্গল সার্কাস। গোপীনাথ সেই দলেরই একজন। গোপীনাথকে যে কি চোখে দেখলেন তিনি! সার্কাসটি তার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন। গোপীর চেহারা চমৎকার। আর একটু লম্বা হলে একে বারে নিখুঁত বলা চলতো। সম্ভবতঃ তারই আকর্ষণে কোহিনূর সার্কাসের মালিকের বোন জুয়েল পালিয়ে এসে বিয়ে করলো গোপী নাথকে। জুয়েল কোহেনকে আজও অনেকের মনে আছে। ট্রাপিজকুইন চামেলীর তিনপুরুষ কাটলো সার্কাসে। তার বুড়ী শাশুড়ী আজ ছেলে-বৌয়ের রোজগারে হাতভরা বালা-চুড়ি প'রে বসে বসে তাস পেটে তাঁবুতে আর চামেলীর বাচ্চা দুটোকে দেখে শোনে। সে জুয়েলের কথা আজও বলে। বিদ্যুৎ-এর মতো সুন্দরী ছিলো জুয়েল। তেমনি ছিলো তার তেজ। পাঁচহাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছিলো সে। গোপীমাস্টারের এই সার্কাস বলতে গেলে তার হাতে গড়া। এত করেও ভোগ করতে পারেনি জুয়েল। ট্রাপিজে যখন দুলতো জুয়েল গোলাপী সাটিনের জামা পরে, দেখলে তাক লেগে যেতো। এমন ভাগ্যি মেয়েটার, মনোমিল হলো গোয়ানিজ ব্যাণ্ডমাস্টার ছোকরার সঙ্গে। ভালবেসে আরো

বেপরোয়া হলো জুয়েল। বেশী কায়দা করে লাফ মারতে গিয়ে নেটের ওপর বেকায়দায় পড়লো। সেটা প্রথম শো। দ্বিতীয় শো অবধি রইলোনা। মাথা আর ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে কাটোয়ার হাসপাতালে মারা গেল জুয়েল। গঙ্গার ধারে কবর হলো। গঙ্গা-কে গঙ্গা, গোর-কে গোর।

চামেলী বলে—তারপর কি করলো মাস্টার?

বুড়ী গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—মালিকের কথায় কাজ কি তোর বৌ? রাউটিতে যা।

—রাউটি নেইকো আজ।

—জ্বালাস্‌নি বৌ!

চামেলী হাসে। বুড়ী না-ই বললো। কে না জানে, বৌ মরতে নিশ্চিন্ত হলো মাস্টার? সুন্দরী বৌয়ের ক'রে মাস্টারের মনে ভয় ছিলো। ব্যাণ্ডমাস্টার ছোকরার সম্পর্কে হিংসেটা জানান্ দিতেও ভয় পেতো সে। তারপর থেকে মাস্টারও ফুর্তি করতে শিখেছে। তবে মালিকের সম্পর্কে এসব কথা ভাবতে নেই।

আজ জুবিলী সার্কাসের রম-রমারম অবস্থা। তাগড়া বুকখানা ফুলিয়ে গোপীমাস্টার বলে,

—দেড়শো বাঙালীকে খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি, সোজা কথা নয়!

গর্ব করতে পারে বটে। ছোটখাটো একখানা শহর টেনে চলেছে গোপীমাস্টার। তাঁবু সে-ই কত বড়ো রে, ওপরে চাইলে মাথা ঘুরে যায়! দড়ি-দড়া, কাছি, রশি সেই কোন্-না পঞ্চাশ মন হবে! গ্যালারী তক্তাপোশ, মোটর-সাইকেল চালাবার মরণ-গ্লোব, সাইকেল, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, কালো বাঘ, ছাগল, বাঁদর, কুকুর, উট—কি আছে, কি নেই! তাঁবুতে বসে খলিফা হরদম কল চালাচ্ছে। উট খাবে নিমপাতা, ছোলা। হাতি দিনের বেলা খাবে চাল-বিচালি, রাতে খাবে আটার রুটি, ঘি। বাঘ-সিংহের জন্য ঝুড়ি-বোঝাই মাংস আসছে। ওদিকে

রাউটির সময় হলো। রাউটি মানে প্র্যাকটিস। তাঁবুতে ফাঁকা গ্যালারীর সামনে দাঁড়িয়েছে গোপীমাস্টার। রাউটি দিচ্ছে মেয়েরা, একচাকার সাইকেলে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে হাতে হাত ধরে। বারের খেলা যারা দেখাবে, সেই সব ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে। এরা সরলেই তারা ঢুকবে। সাত থেকে দশবছরের দশ-বারটা ছেলেমেয়েকে নোয়ান ফেলতে শেখাচ্ছে কেউ। 'বোন্‌লেস্‌' আর 'পীকক' এই হলো সার্কাসের ছেলেমেয়ের অ-আ-ক-খ।

উট, হাতি, ঘোড়া নিয়ে শহরের পথে বেরিয়ে পড়েছে কীপার। ভালুককে দীঘিতে নাওয়াচ্ছে কেউ। বাচ্চা ভাল্লুক। জল ছেটাচ্ছে ফুর্তিতে। বড় বড় হোস-পাইপ এনে বাঘ-সিংহের খাঁচা ধোলাই হচ্ছে জল ঢেলে।

এতগুলো মানুষের রান্না হচ্ছে যেখানে, সেখানে তাঁবুতে সাত-আটজন চাকর গলদঘর্ম হচ্ছে। আবার যারা ফ্যামিলি নিয়ে আছে, তাদের যার যার তাঁবুতে রান্নার ব্যবস্থা। তাঁবুতে থেকে এদের এমনি হয়েছে যে, চারদেয়ালের মধ্যে ঘুম আসেনা মোটে। বলে,—হাপ্‌সে উঠি গো। অব্যেস নেই কিনা! চামেলীর ছেলেমেয়ে বলে,—মা, ঘরে শুতে কেমন লাগে গো? ছ্যালের গরম ওঠেনা?

এরই মধ্যে মেয়েরা নেয়ে নিচ্ছে। জল ধরছে। রঙীন কাপড়-জামা মেলে দিচ্ছে তাঁবুর দড়িতে। হাঁস-মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছে আশপাশ দিয়ে।

এই চলমান জীবনের মালিক গোপীনাথ। গর্ব সে করতে পারে বৈকি। ন্যায্যতই গর্ব করতে পারে।

প্রেমতারা এই সার্কাসে এসেছে আট বছর আগে। তারও আগে ছিল গোমেজ-সায়েবের সার্কাসে। সৎমা ঘরে আসাতে ফুটফুটে পাঁচবছরের মেয়েকে সার্কাস-দলে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো বাপ। নোয়ান-বোন্‌লেস্‌—নোয়ান-পীকক। রিং-মাস্টারের হাতে চাবুক। ছোট্ট পাঁচবছরের শরীরকে কষ্ট করে বাঁকানো, নোয়ানো, দুমড়ে

ফেলা। ভোরবেলা একমুঠো মুড়ি খেয়ে রাউটিতে এসে পাঁচবছরের সেই মেয়ের পেটের ভেতরটা কেমন জ্বলতো, বিশবছরের প্রেমতারার সে কথা আজও মনে পড়ে। ঠিকমতো পারলে পরে রিং-মাস্টারই নিয়ে যেতো তাকে টিফিনখানায়। চা বিস্কুট কেক খাওয়াত। বলতো,—তোর চোখে চোখ রেখে দেখেছি, ভয় নেই তোর। একদিন নাম করবি তুই, দেখিস? কিন্তু রিং-মাস্টার জানতোনা নাম করতে চায়না প্রেমতারা। নাম না হওয়াই ভালো। নাম করে যারা তারা বেশীদিন বাঁচেনা সার্কাসে। নাম করেছিলো চাঁপা। কালো রঙ, হাসিখুশী মেয়ে। চাঁপাকে ডেকে মেমসায়েবরা মেডেল দিতো। চমৎকার শিখেছিল চাঁপা। কিন্তু বর্ধনবাবুর সঙ্গে খেলা দেখাতে গিয়ে কি হলো তার? সে কথা ভাবলে ভয়ে চোখের জল শুকিয়ে যেতো প্রেমতারার।

কিন্তু তার ভয় হয়েছে বলে ত' সার্কাস মানবে না। প্রেমতারার মনে হতো এমন করে মরণের সঙ্গে নিত্য খেলতে তাকে দিয়ে গেল কেন বাবা? সে কি অনেক ভাত খেতো? না অনেক জামা পরতো? মনে হতো বিমাতার গঞ্জনা সে সইতে রাজী আছে। এই মৃত্যুভয় আর সয় না।

ভয়ের পরীক্ষা হলো তার সাতবছর বয়সে। গোমেজ-সায়েবের সার্কাসে বর্ধনবাবু দেখাতো খেলাটি। চিত হয়ে শুতো বর্ধনবাবু। তার পায়ের ওপর টুল খাটিয়ে খাটিয়ে উঁচু করে, তারও ওপরে একটা পিপে শোয়ানো। সেই পিপের ভেতর থেকে বেরুতো প্রেমতারা। সেই পিপের ওপরে পীকক, নোয়ান, বোন্‌লেস্ দেখাতো। যারা দেখতো তাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠতো। খেলা শেষ হয়ে গেলেও তার ভয় যেতোনা। রাতে নিজের ছোট খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমের মধ্যেও মনে হতো তাকে তুলে কারা ঠেলে দিচ্ছে ওপরের দিকে। কতো ওপরে তার দিশা নেই। নিচের দিকে চাওয়া যায় না। গা সিরসির করে। মনে হয় এ-ই জীবনের শেষ দিন। চাঁপার মতো

সে-ও যদি মরে যায়? চাঁপা পিপের থেকে বেরুতে গিয়ে পড়ে গেল বলেই-না প্রেমতারা প্রোমোশন পেলো পিপের খেলায়? নয় বছরের কালো মেয়েটার সাদা সাটিনের পোশাকে রক্তের দাগগুলো কোনোদিন ভুলবে প্রেমতারা? মনে হতো, আর ভয়ে কাঁদতো সে। তবে সে-কান্না কেউ শুনতোনা। সার্কাসের মেয়েরা কাঁদলে সে-কান্না কেউ শোনেনা। তাদের চোখের জলও কেউ মুছিয়ে দেয় না। সার্কাসের মেয়েদের শক্ত হতে হয়।

আট থেকে কুড়ি বছরে পৌঁছাবার পন্থাটা অন্যরকম, সার্কাসের মেয়ের জীবনে। বয়সটা অমনি-অমনি আসেনা। দাম দিতে হয়। দাম আদায় করলো বিভিন্ন মানুষ। দাম দিয়ে দিয়ে বড় হলো প্রেমতারা। বয়স যেমন ভরে উঠলো, তেমনি নিজের দামও বুঝতে শিখলো প্রেমতারা।

তিন সার্কাস ঘুরে তবে গোপীনাথের সার্কাস। এখন প্রেমতারাকে চেনেনা জানেনা কে? সিংগল-হুইল, তারের খেলা, লায়ন-কুইন, ইস্টার্ণ সাইকেল, সিংগল আর ডবল ইস্টার্ন, রাইফেল নিয়ে বেলুন ফাটান, ব্যালান্স ট্রাপিজ, পালটি—একলা অমন বারোটা নম্বর দেখাতে পারে প্রেমতারা। নাগিয়ার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে বাঘের খেলা দেখাতে পারে। গোপী দেয় না। দলের ভেতর শত্রু বাড়িয়ে লাভ কি? প্রেমতারার বিষয়ে বড় মনোযোগী গোপীনাথ। সব জানে প্রেমতারা। জেনেশুনে তার পাল্লা ভারী হয়েছে। চলে হেলেদুলে। কথা বলে গুমোর করে। যেন রাই গরবী। যেন মা-বাপের দিশা ছাড়া সার্কাসের মেয়ে নয়—এমন একজন, যার অনেক আছে।

মনোহর এ সার্কাসে ঢুকল নফর হয়ে। সার্কাস তখন রংপুরে। টাউন ক্লাবের মাঠে তাঁবু পড়েছে। একটা সমস্যার সময়। গোপীমাস্টার একটা বাঘ কিনেছে। তাকে বিগড়ে দিয়েছে নাগিয়া। আরো একজোড়া সিংহ আর সিংহী আসছে আকুলি ব্রাদার্সের কাছ থেকে। তিনহাজার টাকায় একজোড়া সিংহ আর সিংহী কেনা

হয়েছে। একেবারে বাচ্চা। এখন একটি মানুষ চাই যে আদর যত্ন করে পালবে এদের। আদর বিনা মরেই যাবে।

মনোহর এলো সায়েবের সার্টিফিকেট নিয়ে।

পঁচিশবছরের তাগড়া জোয়ান ছেলে ডোরাকাটা গেঞ্জি আর নীল খালাসী-প্যান্ট পরে যখন এল, সায়েবের সার্টিফিকেট দেখে এককথায় গোপীমাস্টার তাকে চাকরি দিল। সার্টিফিকেটটা ময়লা হয়েছে হাতের তেলে। তবু পড়া চলে। মাইনে পঞ্চাশ। কাজের নাম জাঁকালো—লায়ন-টেমার।

নতুন মানুষ এলো কাজে। শুনে, আগেই এলো নাগিয়া। বেঁটে, কালো, কোঁকড়া-চুলো নাগিয়া রুক্ষ আর অভদ্রভাবে খোঁচা মারলো পাঁজরে। বললো,—কোথাকার আমদানি? বলি জেল-ফেরত নাকি? কয়েদীর জামা পরেছিস্ কেন?

—অ্যাই, অ্যাই নাগিয়া—শুধুমুধু লাগছো কেন? যা শুধোবে আমাকে শুধোও।

সামলাতে গিয়ে মনোহরের ওপরেই খাপ্পা হয়ে উঠলো গোপীমাস্টার। বললো,

—যাও ওদিকে। বললাম সব দেখে শুনে নাওগে।—সাম্বো!

একনম্বর জোকার সাম্বো নিয়ে গেল মনোহরকে। প্যাকিং-বাক্স টেনে বসলো নাগিয়া। বললো,

—কি মতলব? ফট করে নতুন মানুষ?

নাগিয়ার কুটিল চোখের সামনে অসহায় গোপীনাথ। মুখে সে-ভাব প্রকাশ না করে হাসলো। বললো,—

—সস্তায় পেলাম। বাঘ-সিংহগুলো দেখবে। চোখে চোখে চেয়ে নাগিয়া সুর ভাঁজলো। বললো,—আচ্ছা?

—তোমার খেলা তোমারই থাকলো।

—বলছো!

ব'লে উঠে পড়লো নাগিয়া। বললো,—জুন মাসের হিসেব বানাও। টাকা চাই।

বেরিয়ে গেল নাগিয়া। নাগিয়াকে কেন যে ভয় করে গোপীনাথ। শুধু নাগিয়া বলে নয়, ভয়ের একটা ভূত তার মনে আছে। বেশ শক্ত ধাতের কোনো মানুষ দেখলেই সেই ভূতটা মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠতে থাকে তার মনে। প্রয়োজনমতো কড়া হতে পারে না গোপীনাথ। ভয় পায়। অথচ কিসের যে ভয় তার বোঝাতে পারবে না সে। নাগিয়াকে ভয় পায় স্পষ্টই। এড়িয়ে চলে। পারতপক্ষে ঘাঁটায় না। গোপীনাথের যত দাপট তা শুধু তার দয়ার ওপর নির্ভর যাদের সেই কমজোরী মানুষগুলোর ওপর। দুর্বল আর অসহায় মানুষকে খুঁচিয়ে গোপীনাথ নিজের কাপুরুষ বিবেকের শাসন থেকে বাঁচে। এদিক থেকে তার আর নাগিয়ার মিল আছে। নাগিয়ার সঙ্গে মিতালি হওয়াই উচিত ছিলো। কিন্তু সম্পর্কটা খিঁচড়ে গিয়েছে।

এখন নাগিয়া বেরিয়ে যেতেই সে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হিংস্র হয়ে উঠল।—অ্যাই হারাণ···গাধা কোথাকার···চায়ের কাপটা নিয়ে যা—

রান্নাঘরের ছোকরা হারাণ কাঁপতে কাঁপতে এলো। কাপ-ডিশ দুটো ভেঙে তার চাকরি ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ঝুলছে।···হুঁশিয়ার শা— ব'লে এমন হুমকি দিলো গোপীনাথ, যে হাত থেকে কাপটা পড়ে যেতো হারাণের। কাপটা সে ভাঙুক, এই চায় গোপীনাথ। তা হ'লেই হারাণকে বরখাস্ত করা সহজ হবে। এই জ্ঞানটাই ইদানিং বাঁচাচ্ছে হারাণকে। কানি মেরে কাপটা বাঁচিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

নাগিয়াকে চারশো টাকা নগদ দিতে হবে, এই ভেবেই বিরক্ত গোপীনাথ হিসেবের খাতা খুললো। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে একটা হাসির হররা শোনা গেল। পাঁচমিশেলী শব্দ। তারই মধ্যে একটা কাঁচামিঠে গলার হাসি পাখীর শিসের মতো লহরে লহরে কাঁপছে

কাঁপতে খাদ থেকে চড়ায় উঠে ভেঙে পড়লো। বেরিয়ে এলো গোপীনাথ।

সার্কাসের মানুষগুলির কঠোর শ্রমের জীবন। এমন হাসির খোরাক তাদের নিত্য জোটে না। গোপীমাস্টারের তাঁবু থেকে বেরিয়ে নাগিয়া মনোহরের খোঁজে যায়। বাঘের খাঁচার সামনে গিয়ে হঠাৎ দরজা খুলে দেয়। ভয় দেখাতে গিয়ে নিজেই বিপাকে পড়লো। দরজা গেল খুলে। বাঘ বেরুবার আগেই নাগিয়া ছুটলো দড়িদড়া টপ্‌কে। কৌতূহলে বাঘও তারই পিছনে ছুটলো। তাঁবুর দড়ি বাঁধবার শালের খুঁটি বেয়ে তড়বড়িয়ে উঠে গেল নাগিয়া। মনোহর সকলের সঙ্গে নাগিয়ার বিপদে হেসে খুন হলো। তারপর এক হাঁকার দিতে অভ্যাসের বশে বাঘ আবার এসে ঢুকলো খাঁচায়। তখন নেমে এলো নাগিয়া। কিন্তু নাগিয়ার ওপর মানুষগুলোর অনেকদিনের রাগ পোষা আছে। গোপীনাথের পেটোয়া মানুষ নাগিয়া এতদিন নানা ছলছুতোয় খুঁচিয়েছে মানুষগুলোকে। আজ নাগিয়াকে নাজেহাল হতে দেখে সবাই খুশী হলো। হাসলো সমস্বরে। প্রেমতারার হাসি আর থামতে চায় না। গজরাতে গজরাতে নাগিয়া গেল নিজের ঘরে। প্রেমতারা বললো—

—বাঘ বশ করতে শিখলে কোথায়?

—আমি যে বাঘ পুষি।

আর একপশলা হাসলো প্রেমতারা। বললো,—দেখা যাবে! ঐ বাঘের বাঘিনী আমি। সন্ধ্যেবেলা দেখো।

সন্ধ্যেবেলা কেন? সকালে দেখতেই বা মন্দ কি? উগ্র ফরসা রঙ। স্বাস্থ্যের তেজে টান-টান চামড়া। নীলচোখে বিদ্যুৎ। যেন চড়া রোদে কেউ ইস্পাতের ছুরি খেলিয়ে নিল একখানা। চেরা সিঁথির দু'পাশে ফুলে উঠেছে ক্লিপে আঁটা রুক্ষ চুল। জংলা ছাপের শাড়ি পরণে। কেমন হেলে-দুলে চলে গেল মানুষ। নিজের ঠমকে নিজেই ভরা-ভরা।

আবার তখনি দেখা গেল দুই হাতে দুটো বালতি ভরে নিয়ে যাচ্ছে চাঁচের বেড়ার ঘরে। কাঁধে গামছা-কাপড়। ভরা বালতির জল ছলকাচ্ছে না। হেঁটে যাচ্ছে যেন পা পড়ছে না মাটিতে।

মনোহরের পিঠে হাত রেখে সাম্বো ভাঙা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলে—

—তোমার কাজ তুমি দেখ। পরকে দেখবার দরকার কি ?

—দেখবার মানুষ যে !

খোলা গলাতেই বলে মনোহর। দেখতে সুন্দর, তাই তারিফ করেছে। দোষ করেছে কিছু ?

—নাগিয়া দেখবে খেলার সময় তাঁবুতে। আর দেখবে মাস্টার। তোমার আমার দেখতে মানা। তবু হ্যাঁ মানুষ ভালো। জিজ্ঞেসাবাদ করে, খোঁজ-তালাস নেয়। মাস্টারের মতো নয়।

—মাস্টার মানুষ কেমন ?

জবাব না দিয়ে হঠাৎ সামনে থেকে একগোছা দড়ি তুলে নিয়ে— এই, এই দু'নম্বর !—বলতে বলতে লাট-খাওয়া ঘুড়ির মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল একনম্বর। পেছনে দাঁড়িয়ে গোপীমাস্টার।

মনোহর মাথায় গোপীমাস্টারের চেয়ে একহাত লম্বা হবে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে হাসলো মাস্টারের দিকে চেয়ে।

নতুন বহাল মানুষের সামনে গোপীমাস্টার জবরদস্ত মালিক। ব্যক্তিত্ববিহীন গলাটা অকারণ কড়া ক'রে বললো,

—মাস্টার কেমন মানুষ, সে খোঁজ পরে করবে। নিজের কাজ দেখে বুঝে নিয়েছ ?

চরিত্রে ব্যক্তিত্ব নেই বলেই হয়তো গলাটা রুক্ষ রূঢ় না করে পারেনা মাস্টার। দুইনম্বর জোকার বুঝি তাকে এড়িয়ে চলবে বলেই বাঘের খাঁচার ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাকে বিশ্রী একটা গালি দিয়ে ডাকলো মাস্টার। বললো,—নিয়ে যা। নতুন মানুষ।

লায়ন-টেমার মনোহর, কিন্তু গোপীমাস্টারের সিংহ রাণাকে পোষ মানাবার কিছু নেই। ছোট খাঁচায় রাতদিন কাটিয়ে রাণার বুকের পাঁজরা গোনা যায়। বিবর্ণ ঝুলে-পড়া চামড়া। মানুষের নিরন্তর সাহচর্যে মানুষের যে পরিচয় পেয়েছে রাণা, সেটা নির্বোধ ও নিষ্ঠুর। মানুষকে পশুর চেয়ে অনেকাংশে হীন জেনে রাণার চোখে একটা নিরুৎসুক ঝিমিয়ে-পড়া চাহনি।

রাণা ছাড়া আর একটা বাঘ আছে। এরা গোপীমাস্টারের কোনো সমস্যা নয়। মনোহরকে এদের জন্যে না রাখলেও চলতো। মাস্টার বললো,

—তোমাকে এনেছি বাদশার জন্যে। বাদশাকে খেলাবে নাগিয়া। কিন্তু নাগিয়া পোষ মানাতে পারে না। বাদশা বিগড়ে যায় ওকে দেখলেই। হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি। বাদশাকে তুমি দেখবে মনোহর—

মুখোমুখি দাঁড়ালো মনোহর। খাঁচার সামনের দিকে বসে আছে কাত হয়ে, মাথা ঈষৎ তুলে। তিনবছরের তাজা জানোয়ার। বায়স্কোপ-কোম্পানির সায়েবের কাছ থেকে হাতবদল হয়ে সবে এসেছে সার্কাসে। এখনো চামড়া সতেজ। পিঙ্গল সবুজ চোখের তারা এখনো আফিমের মৌতাতে সরু হয়ে কুঁচকে যায়নি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার-স্বরূপ সে জঙ্গল, নদী, পাহাড় ও আকাশের বিস্তীর্ণ একখানা মালিকানা পেয়েছিলো। সেইখান থেকে তাকে এনে এই স্বল্পপরিসর কয়েদে রেখেছে যারা, সে-মানুষের ওপর তার কোনো আস্থা নেই। তার চোখে অনাস্থা আর তাচ্ছিল্য। তবু সে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতেও রাজকীয় মর্যাদা পরিস্ফুট। মনোহর দাঁড়ালো খাঁচার সামনে। চোখে চোখে বাঁধা পড়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেলো। তারিফ ক'রে বললো,

—আহা-হা! চমৎকার।

কষ্টে পাশ ফিরল বাদশা। মাথাটা আস্তে নামিয়ে দুই থাবার

ওপর রাখলো। আর তখনি চোখে পড়লো বিশ্রী একটা লাল ঘা। ঘাড়ের কাছ থেকে সামনের ডান পায়ের ওপরের ভাঁজ অবধি নেমেছে। দেখে মনোহর বললো,—ইশ্‌শ্‌! কেমন করে কাটলো?

—ঐ নাগিয়া শা—! ব'লে গালি দিয়ে মাটিতে থুথু ফেলে নাগিয়ার সম্পর্কে আবার কটু মন্তব্য করলো গোপীমাস্টার। বললো,

—ও-ই কাঁটা-তারের চাবুক মেরে ঘা করেছে।

—তবে আর তাকে মানবে কেন তোমার বাঘ? মারতে আছে কখনো?

—একেই মানাতে হবে তোমার। আমার লোকস্‌ান হয়ে যাচ্ছে। খেলাচ্ছে না ব'লে তো খাওয়া কামাই দিচ্ছে না বাঘ?

মনোহর বললো,—বাঘ আমি মানিয়ে দোব। কিন্তু খাঁচা আমার বড় ক'রে দিতে হবে, মাস্টার। চওড়া হবে, লম্বা হবে। দু-হাত গা খেলিয়ে ঘুরে আসবে জানোয়ার। মাথার ওপরে কেমন ঠুকছে দেখছ না? গরম হচ্ছে না ওর?

—প্রথমেই যে অনেক টাকার কথা বলছো তুমি?

—টাকার কথা বলো না গো মাস্টারকে। টাকা খরচা করতে মাস্টার ভারী নারাজ।

প্রেমতারার কথা শুনে ভ্রূকুটি করলো মাস্টার। বললো,—তুমি এখানে কেন? সব কথায় কথা বল কেন প্রেমতারা?

স্নান করে টিয়াপাখী-রঙের কাপড় পরেছে প্রেমতারা। চুলে রিবন বেঁধেছে। মুখে সাদা করে পাউডার মেখে ভুরুর মাঝখানে আলগা টিপ পরেছে। বেশ ঠাণ্ডা ভাব। এক কথা শুনেই চলে যাবার মতো ছট্‌ফটে নয়। মাস্টারকে উপেক্ষা করে সে মনোহরের দিকে চেয়ে হাসল।

মাস্টারকে কিছু বলতে না দিয়ে মনোহরই মিষ্টি ক'রে হাসল। বললো,—উনি তো ঠিক কথাই বলছেন। তবে কি, খরচাটার

দরকার আছে। হাজার টাকার জানোয়ার অমন দশ-বিশহাজার টাকা খেলা দেখিয়ে তুলবে। তার ঘরের জন্যে পঁচিশটা টাকা খরচ করবে না? সায়েব বলতো—

সকাল থেকে এই সায়েবের কথা তিন-চারবার শুনলো মাস্টার। এখন তাড়াতাড়ি থামাল মনোহরকে। বললো,—

—ছুতোর ডেকে ফুরোন করে দোব। ঘর তুমি বানিয়ে নাও। আর দেখ যদি সায়েস্তা করতে পারো বাদশাকে। এই কুড়িদিন বাদে গোরাবাজারে কলেজের মাঠে তাঁবু ফেলব। এক মাস চলবে খেলা।

—দেবো।

এমনি ক'রে কাজে বহাল হলো মনোহর। লায়ন-টেমার মনোহর। জুবিলী সার্কাসের বাঘ-সিংহের স্বত্বহীন মালিক। মালিক কিসে? না তদ্বির-তদারক করবে, ডলাই-মলাই করবে, দুপুর টাইমে খাঁচার ছাদ খড় চাপা দিয়ে ঠাণ্ডা করবে, খেলা অভ্যেস করবে। সকাল থেকে মালিকানা স্থুরু মনোহরের, সন্ধ্যে অবধি। খেলা দেখাবার মালিক নাগিয়া। তখন আর মনোহরের কোনো কাজ নেই। তাঁবুর ভেতরে খাঁচা ঠেলে আনবার পর খাঁচার দোর খুলে দিয়ে পাশে দাঁড়াবে, সে-ও মনোহর। তার সেই খালাসী-প্যাণ্ট, আর ডোরাকাটা গেঞ্জি পরে। তারপরের তিন ঘণ্টার রাজা নাগিয়া। রাজা গোপীমাস্টার। সাটিন আর জরির জামা পরে, বুকে মেডেলের মালা ঝুলিয়ে ব্যাণ্ডের তালে তালে বাদশা-রাণাকে নিয়ে খেলা দেখাবে তারা। আরবী-ঘোড়া বাহাদুরের পিঠে দাঁড়িয়ে কসরত দেখাবে গোপীমাস্টার। দুইজনের খেলার জৌলুষকে ম্লান ক'রে ঢুকবে প্রেমতারা। সাটিনের আঁটো পোশাক, জরির ছাতা জরির রিবনে তিনঘণ্টার রাণী প্রেমতারা। নাগিয়া, গোপীনাথ আর প্রেমতারার জন্যে ব্যাণ্ড বাজবে, মানুষ হাততালি দেবে, দুই জোকার সাম্বো-জাম্বো ভাঁড়ামো করবে। ডিগবাজি খেতে খেতে ঘুরবে।

এসব সময় মনোহর কিছু করবে না। সে শুধু দেখবে পাশে দাঁড়িয়ে। সে শুধু সাহায্য করবে। নাগিয়ার খেলা হ'লে বাঘকে ঢুকিয়ে নেবে। জঙ্গী হাতির পিঠে প্রেমতারা যখন আসবে তখন পায়ের কাছে লোহার বল গড়িয়ে আনবে। সে ট্রাপিজের দোলনা খাটাবে। তাকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে রেখে নাগিয়া আর প্রেমতারা উঠে যাবে দুলতে দুলতে সেই ওপরে। তাঁবুর শীষের কাছে, মানুষের নাগালের বাইরে হেসে হেসে তারা কতো রকমের খেলা দেখাবে। কানাত-ভরা মানুষের সঙ্গে মনোহরও তাকিয়ে থাকবে ওপরে। এই তার কাজ। সে শুধু মাটিতে পা রেখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকবে। এই বাজনা, আলো, হাততালি আর উত্তেজনার জগৎ তার জন্যে নয়।

তিন ঘণ্টা কেটে গেলে আবার মালিকানা ফিরে পাবে মনোহর। খাঁচার আঁধারে ফিরেও বাঘের গরগরানি থামতে চায় না। অভ্যাস-মতো ল্যাজ আছড়ে রাণা চায় আফিম। তখন বাঘের খাঁচায় জল দেবে মনোহর। খাঁচা আনবে খোলা আকাশের নিচে। রাণাকে দেবে আফিম। বুড়ো হাতি জঙ্গীকে বালতি বালতি জল খাওয়াবে। কানের পিঠের একটা ঘা শুকোতে চাইছে না জঙ্গীর। বুড়ো হয়ে গিয়েছে সে। বয়স এবং জরার একটা মিশ্রিত গন্ধ জঙ্গীর শরীর থেকে বেরোয়। চোখের কোলে কেবলই পিঁচুটি পড়ে। পিঠ বেয়ে উঠে মলম লাগাবে মনোহর জঙ্গীকে বসিয়ে। চোখের কোণ পুঁছবে। শেকল পরিয়ে পরিয়ে ঘা হয়েছিলো জঙ্গীর পায়ে। ঘা সারিয়েছে মনোহর। শেকল বদ্‌লে দড়ির ব্যবস্থা করেছে।

এইসব সে যতক্ষণ করবে ততক্ষণই সবচেয়ে বড়ো খাঁচাটা থেকে অসন্তুষ্টির একটা গরগরে আওয়াজ উঠতে থাকবে। সব হ'লে পরে সেখানে যাবে মনোহর। খাঁচার দরজা খুলে বাদশার গলার নিচে হাত দেবে। সুড়সুড়ি দেবে। আধো আঁধারে বাদশার চোখের মণি জ্বলজ্বল করে। তা দেখে ভয় পায় না মনোহর। বাদশার বিশ্বাস অর্জন করতে তার সময় লেগেছে। মানুষজনের সামনে নয়।

রাতের আঁধারে বাদশার খাঁচার সামনে বার বার ফিরে এসেছে মনোহর। অন্ধকারের গায়ে গা মিশিয়ে ভাব করেছে বাদশার সঙ্গে। বাদশার ভয় আর অবিশ্বাস ভাঙতে সময় লেগেছে। ইলেকট্রিক চাবুক দেখলে মাথা নিচু করেছে বাদশা! আবার চাবুক সরালেই গরগরিয়ে উঠেছে। বাদশাকে ভালবাসার ইচ্ছে মনোহরের। তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছে নাগিয়া। জোকার সাম্বো টিটকিরি দিয়েছে। তাজমহল-আঁকা চটি পরে ঝুটো কাঁচের দুলে ঝিলিক দিয়ে প্রেমতারা বলেছে,—

—ও তোমার কাজ নয়। সে-সব মানুষ অন্য জাতের।

একদিন মরিয়া হয়ে মনোহর চাবুক ফেলেই ঢুকলো বাদশার খাঁচায়। জাম্বোকে বললো,—

—যদি এমন-তেমন বুঝিস্ তো মাস্টারকে ডাকবি, নইলে নয়। মোটে ভয় খাবি না। খাঁচার পাশে গুঁড়ি মেরে থাকবি চাবুক নিয়ে। চাইব তবে দিবি।

ঘা-টা বেড়ে বেড়ে জ্বর হয়েছিলো বাদশার। মনোহর সাহস করে ঢুকলো খাঁচায়। এই পনেরো দিন ধরে এই একটা মানুষ তাকে খাবার দিচ্ছে, জল দিচ্ছে। বাদশা চিনেছে মানুষটাকে। এ যে তাকে বিশ্বাস করে, ভয় করে না—সে কথাটা বুঝেছে। বুঝে গরগর করলো এখন। থাবা তুলল না। ধুঁকতে ধুঁকতে পাশ ফিরল।

ভয়কে জয় করলো মমতা। কি ক'রে কি হ'লো কেউ জানে না। সার্কাসের মানুষ অবাক হয়ে দেখলো গল্পকথা সত্যি হয়েছে। খাঁচার দরজা খুলে মনোহর ঢুকে বাদশার গলার নিচের ঘায়ে ওষুধ লাগাচ্ছে মোটা ক'রে। ঘড়ঘড় করছে বাদশা। তবে তার চেয়ে বেশী ফুঁসছে না।

আর সকলের সঙ্গে গোপীনাথও দেখতে এসেছিলো। দেখে, ভয়ে ভেতরটা তার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। উৎফুল্ল মনোহর যখন হাসতে হাসতে এলো, বললো,—মাস্টার পেরেছি। এবার সাতদিনের মধ্যে

তোমার বাদশা তাঁবুতে যাবে।—তখন অল্প কথায় তাকে বিদায় করলো গোপীনাথ। মনোহরকেও ভয় করছে তার।

ঘা সারতে-না-সারতে নতুন খাঁচা এলো। খাঁচা ঝাড়ঝুড় দিয়ে সাফ করে খড় বিছিয়ে একদিন গৃহপ্রবেশ হলো বাদশার। পুরোনো খাঁচা সামনে এনে দরজা তুলে ধরতে নতুন খাঁচায় ঢুকলো বাদশা। এ খাঁচায় জায়গা বেশী। চলাফেরা করা যায়। মাথার ওপরে জালি-কাটা মোটা জাল। রোদ এসে গায়ে লাগে। মনের খুশিতে হাঁকার দিলো বাদশা।

যতক্ষণ সবাই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দেখছিলো মনোহরের কাণ্ডবাণ্ড ততক্ষণ প্রেমতারা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো। এতদিন ধরে শুধু দেখছে প্রেমতারা। তাকে দেখেও যে দেখেনা, যে মানুষের চোখে তারিফ ফোটেনা প্রেমতারার জৌলুষ দেখে, তার সঙ্গে সেধে কথা বলে মান খোয়ায়নি প্রেমতারা। তবে তার নীল চোখ টান করে দেখেছে নজর ক'রে কেমন সকলের মধ্যে থেকেও স্বাধীন চলাফেরা মানুষটার। কেমন ক'রে দুই জোয়ান হাতের সেবাযত্নে সে বনের বাঘটাকে বশ করলো। দেখলো, কেমন কাজটা ভালবাসে মনোহর। যা করে, ফুর্তি ক'রে করে। তাকে দিয়ে যে অন্যায় খাটিয়ে নিচ্ছে গোপী-মাস্টার, সে বোধ যেন মনোহরের নেই।

আজ আর চুপ করে রইলোনা প্রেমতারা। তার পাশে দাঁড়িয়ে ক'টা রসের কথা বলছিলো নাগিয়া। বলছিলো,

—আমি তুমি পালিয়ে যাবে। মাস্টার বড় বেইমান। টাকা নিয়ে আমি তুমি দল বানাবে। তোমাকে আমি সাঁচ্চা সোনার চুড়ি দেব প্রেমতারা!

এরকম কথা নাগিয়া রোজই বলে। প্রেমতারা রোজই শোনে আজ আর শুনল না। শুনতে-শুনতেই নাগিয়ার অস্তিত্ব একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল। মনোহরের মুখোমুখি দাঁড়াল। বললো,

—চল মনোহর, চা খাই।

নিজের তাঁবুতে স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বেলে নিজের পেয়ালায় চা ক'রে মনোহরকে দিলো প্রেমতারা। মনোহর মুগ্ধ হয়ে বললো,

—আজ সূর্য কোন্‌দিকে উঠলো প্রেমতারা?

মিষ্টি হাসলো প্রেমতারা। বললো,

—আজ যে তোমার বাদশা নতুন ঘরে এলো গো। নতুন ঘরবসত হলে মিষ্টি খাওয়াতে হয়না মানুষকে?

—তবে আমিই মিষ্টি খাওয়াব।

প্রেমতারা দেখছিল মানুষটাকে। বললো,

—জামাটি যে তোমার ছিঁড়ে গেছে, মনোহর। ছেঁড়া জামা পরে তাঁবুতে যেওনা তুমি। মাস্টারকে বলতে পারো না?

—বলেছে, মাইনে পেলে কিনে নিতে। এমন একখানা জামা দেখিছি না?—এই সবুজ রঙ, চওড়া কলার, একেবারে ফাস্‌ক্লাস!

এ কথাটা বলা উচিত কি না-উচিত একবার ভাবলো প্রেমতারা। তার পর বললো,

—পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেবে, জামা কিনতে হবে নিজেকে? কেন, টাকা তুমি বাড়াতে বলতে পারো না?

—সার্কাসে টাকা কোথায় প্রেমতারা? লস্ খাচ্ছে না মাস্টার?

গোপীনাথ তাকে যা বুঝিয়েছে তাই সরল বিশ্বাসে বলে মনোহর। প্রেমতারা বিস্মিত হয়। বলে,

—কিরকম সোদ মানুষ তুমি? এই না শুনি কত মিলিটারী গুলে খেয়েছো? আমি বলবো, দেখো।

গোপীনাথকে কথা বলবার অন্য কায়দা প্রেমতারার। চেয়ারের হাতলে বসে মাস্টারের চুলে আঙুল চালিয়ে প্রেমতারা বললো,

—তোমার ঐ মানুষটিকে জামা কিনে দাও মাস্টার! ছেঁড়া গেঞ্জি পরে তাঁবুতে ঢোকে—আমাদেরই যে লজ্জার কথা।

প্রেমতারা বললে গোপীনাথ সব করতে পারে। সেদিনই

বিকেলে মনোহরকে ডাকলো গোপীনাথ। বাক্স খুলে একপ্রস্থ নতুন পোশাক বের করে দিল।

সেদিন সন্ধ্যায় জাপানী ছাতা হাতে তারের ওপর নাচতে নাচতে যখন ঢুকলো প্রেমতারা, নিচ থেকে নতুন মানুষ তাকে অভ্যর্থনা জানালো। দেখে খেলার ফাঁকেই চোখে তারিফ করলো প্রেমতারা। লাল-টুকটুকে আঁটো গেঞ্জি আর নতুন সবুজ প্যাণ্ট। গেঞ্জির বুকে সুতোর আঁকা ফুলপাতা। নতুন পোশাকে নতুন দেখাচ্ছে মনোহরকে।

এমনি করে জুবিলী সার্কাসে ভিড়ে গেল মনোহর। ঘর পালিয়ে চা-বাগানে কাজ করেছে মনোহর। মিলিটারী সায়েবের চাকর হয়ে চিতাবাঘ পুষেছে। জাহাজে সুন্দরবন থেকে চাটগাঁ গিয়েছে খালাসীর কাজ নিয়ে। চাটগাঁ থেকে তাকে এনেছিলো এক সায়েব। জীবজন্তু ধরে চালান দেবার ব্যবসা তার। জীবজন্তু সম্পর্কে মনোহরের আশ্চর্য মমতা দেখে অনেক শিখিয়েছিল সে।—চিকিৎসা, যত্ন করার নিয়ম—এই সব। বড়ো একখানা সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলো যাবার সময়। সেই সার্টিফিকেটের জোরেই এখানে চাকরি পেলো মনোহর।

তবে ঐ কথা। নফর হয়েই রইলো। নাগিয়ার সাহায্য করতে গিয়ে ট্রাপিজের খেলা শিখলো অনেক কষ্ট করে। বাদশাকে নিয়ে নতুন খেলা বের করলো। গোপীমাস্টার তাকে কোনদিনও সুযোগ দেবেনা সে জানে। তাই একলাই তাঁবুতে দোল খায় মনোহর। হারাণ আর সাম্বো-জাম্বো দেখে তারিফ করে। প্রেমতারা দেখে। তারিফ করে না। ছি-ছি করে বলে,

—তুমি কি পুরুষ মানুষ? পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তোমাকে নফর খাটাচ্ছে মাস্টার, তাই তুমি মেনে নিচ্ছো? কেন? ভয় পাও কেন? যাও, বলতে পারোনা—আমায় মাইনে বাড়িয়ে দাও? বলতে পারোনা, নফর হয়ে থাকব না আমি—আমায় খেলা দেখাতে দাও?

এসব কথা শুনেও শোনেনা মনোহর। হ্যাঁ, এখনো নফর মনোহর। প্রেমতারার সঙ্গে সমানে-সমানে খেলা দেখাবার কথা সে ভাবতে পারে না। আশমানে গিয়ে তারা হয়ে ফুটে থাকাও তার চেয়ে সহজ কল্পনা। গোপীনাথ তার সে-সব দাবি মানবে না।

তবু মনোহর সুখী। সুখ তার পঁচিশবছরের জোয়ান শরীরের প্রতিটি চলাফেরায় পরিস্ফুট। প্রেমতারার বকুনি খেয়ে আনন্দ তার বেড়ে যায়। বেসুরো গলায় আজেবাজে গান গেয়ে ওঠে,

—"শাম্‌সেরকা কালা ঘোড়া তুষী হ্যায়!..."

বালতি হাতে ছুটে ছুটে কাজ করে। তার এক সুখ বাদশা। বাদশার সঙ্গে দোস্তিতে তার আনন্দ। আর এক-সুখ প্রেমতারা। প্রেমতারাকে দেখে তার আনন্দ। দেখেই সে খুশী।

তার বেশী কিছু চায় না মনোহর।

॥ ৩ ॥

গোপীনাথের ডানহাত হচ্ছে ম্যানেজার কেষ্টবাবু। এই গোটা সার্কাসটি চালাবার পেছনে তার মাথাটি নিরন্তর খাটছে। এ শহরে শো হতে-না-হতে অন্য শহরে গিয়ে ঠিকঠাক করা, এ তারই কাজ। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার ঝক্কিখানা কম নয়। যেন একটা জগৎ-ই চললো শেকড়-বাকড় উপড়ে নিয়ে। খরচও বেশ। দুই-হাজার টাকা। কাছাকাছি পথ হলো তো—হাতি, ঘোড়া, উট অমন হেঁটেও চলে যাবে। নয়তো গাড়ী, ঘোড়া, লরীর ব্যবস্থা করতে হবে। কেষ্টবাবু দড় মানুষ। সুরেন শীল মেস-ম্যানেজারকে যেমন রান্নার ব্যবস্থা বুঝিয়ে দিতে পারে, তেমনই দরকার হয় তো দু-কলম পদ্য লিখে ছাপিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করতেও পারে। 'শুন গো শহরবাসী গ্রেট জুবিলির কথা' পদ্যটি তারই রচনা। আকুলি-

ব্রাদার্সের সঙ্গে লেন-দেন ক'রে জন্তু-জানোয়ার আনে সে-ই। কোন্ বয়সের জন্তু কি খাবে, তার আচার আচরণ কেমন—এসব তার নখদর্পণে। সে-ই ভুল করলো। মনোহরকে দেখে ভরসা পেয়ে সিংহ-জোড়া আনালো গোপীনাথ। দেখা গেল এর দুটোই সিংহী—একটাও সিংহ নয়। গোপীমাস্টারের মাথায় বাজ পড়লো। কেষ্টবাবুর সঙ্গে বকাঝকা হলো খানিক। তারপর আকুলি ব্রাদার্সে সিংহের অর্ডার গেলো। ভাগ্যি ভালো গোপীনাথের। খাস আফ্রিকার সিংহ এলো তিনমাসের। সিংহের জন্যে নতুন খাঁচা হয়েছে মনোহরের ফরমাসে। লোহার জালের ভেতর থেকেই গর্জে উঠলো সিংহ।

বাচ্চা সিংহ। দুধ-পাঁউরুটি খাইয়ে বড় করতে হবে। যত্ন-আত্তির দরকার। চারটে চাকর রয়েছে হুকুম সামলাবে। কিন্তু ঝক্কি নেবে কে ?

মাসীকে ডাকো। চামেলীর শাশুড়ী সকলের মাসী। এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। বললো,—আমরা তো বাচ্চাবেলায় পুষিছি। হ্যাঁ মাস্টার, তুমি সেই বাচ্চা ছেলে, মনে নেইকো আমাদের গোলাপবালার কথা ? গোলাপের মতো রঙ ছিলো গোলাপের। সিংহ পুষতে বড় দড় ছিল মেয়ে। বলি হ্যাঁ তারা, চামেলীর কুকুর নিয়ে তো আদিখ্যেতা করে মরিস ! এই বা তোর কুকুরের চেয়ে বড় কিসে ? আসলে তোরা মেয়েগুলো যেন কেমন ! আমার কোমরে নেইকো জোর। নইলে—!

প্রেমতারা বললো,—আমিই পুষবো।—পুষবো, পালবো। মান্য করাবো। হলো তো ?

ব'লে মনোহরের দিকে চাইল।

সেই থেকে ভাগাভাগি হয়ে গেল। সিংহের নাম হলো শঙ্কর। সিংহী-জোড়ার নাম হলো বেগম আর শা'জাদী। প্রেমতারার তাঁবুতে শোয় শঙ্কর। ক্যাম্পখাটের পাশে খোঁটায় শিকল-বাঁধা

থাকে। সকালে প্রেমতারার পায়ের কাছে বল নিয়ে লোফালুফি খেলে। শেখায় প্রেমতারা—লাই ডাউন! সিট্ ডাউন! অন মাই ব্যাক!—এই খেলাটাই পছন্দ শঙ্করের। প্রেমতারার পিঠে থাবা দিয়ে উঠে বিশ্রী খরখরে জিভে ঘাড় চেটে দেয়। ওদিকে তাঁবুতে ঘণ্টা বাজে। বাচ্ছা ছেলেমেয়ের দলটা—'দিদি! রাউটিতে চলো।' ব'লে ডাকতে ডাকতে চলে যায়। শাড়ী-জামা রেখে রঙীন গেঞ্জী আর খাটো জাঙিয়া পরে চলে যায় প্রেমতারা। চামেলীর স্বামী শশী একচাকার সাইকেল নিয়ে ততক্ষণে তাঁবুতে ঘুরপাক খাচ্ছে, লটকাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে। বাচ্ছা মেয়ে ঝুমুর পিপের খেলা প্র্যাক্‌টিস করছে। ক্লাউনদের সব জানতে হয়। তারা সার্কাসের এক অপরিহার্য অঙ্গ। সকলের সব খেলার সঙ্গে তারা ঠেকা দেয়। অ্যাক্সিডেণ্ট সামলায়। ক্লাউন চারজনই এখন ঝুমুরের কাছে দাঁড়ায়। ঝুমুরের ভয় ভাঙিয়ে দিতে হবে। তারপর না ঝুমুর একটার পর একটা নম্বর দেখাবে নির্ভয়ে?

আজকের রাউটিতে গোপীমাস্টারকে আর কেষ্টবাবুকে যেন গম্ভীর দেখা গেল। মাথা নিচু করে পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিমল। লিভিং-ফাউণ্টেন। বালতি ভরা জল খাবে বিমল। কাঁচা লাল নীল মাছ জ্যান্ত খাবে কুড়িটা। তারপর সেই জল আর মাছ উগরে দেবে কাঁচের বাটিতে। ফের মাছ খেলা করে বেড়াবে। সাধারণতঃ হাসিখুসী থাকে বিমল। আজ তার মুখে মেঘ নেমেছে। কেষ্টবাবু সকলের প্রিয়। স্বভাবটি তার অমায়িক। সেও যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। হলো কি সব?

শশী সাইকেল ঘোরাতে ঘোরাতে এসে কানে কানে বলে গেল—ব্যাপার গুরুতরো। চোর ধরেছে গোপীনাথ।

বিশটা মেয়ে সাইকেলে ঘুরছে। তারই মধ্যে চামেলী চোখ রাঙালো শশীকে। ভুরু তুলে শাসন করলো। শশী মানল্ না। আবার বললো,—সাবধান থেকো, তারা। চোরের বড় উপদ্রব।

—তুমি বউকে সাবধানে রাখো।

—বউয়ের আমি আছি। তোমার ভয় বেশী।

শশীর ওপর রাগ করা সম্ভব নয়। শশী খেয়ালী, ক্ষ্যাপাটে, ফুর্তিবাজ। ট্রাপিজ মাস্টার রাজুক ও তো মেরীকে বিয়ে করেছে। দুজনে তিনশো টাকা কামাচ্ছে। রাজুক কোনদিনও শশীর মতো খুসী নয়। চামেলীর বোঁচা নাক, সরু চোখ। চব্বিশ বছরেই দুটি বাচ্ছা হয়েছে তার। তারাও দু'বছর বাদে পীকক আর নোয়ান স্বরু করবে। শশী কিন্তু ভারি খুসী। সর্বদা হাসিঠাট্টায় মশগুল। এদিকে গুণী ছেলে। সার্কাস জগতেই তার নাম রয়েছে সাইকেল খেলায়। বৌকে ভুটানী, নেপালী বলে ক্ষ্যাপায়। বাঁকা সিঁথিতে সিঁদুর আর পুষ্ট পায়ের ওপর টেনে কালো ইজের পরে বৌ যখন রাউটিতে নামে, তখন গর্বও করে শশী। প্রেমতারাকে বলে,—তুই তো কটা রঙের গর্বে গেলি! বলি, আমার বৌয়ের মতো দেখতে তোকে?

—বে দিছলো কে?

সেও এক মজার কথা। দশবছরের প্রেমতারা গোপীমাস্টারকে বলেছিলো,—চামেলীদিদি এখন আসবেনা। শশীদাদা তার খোঁপায় পাখীকাঁটা গুঁজে দিচ্ছে।

গোপীমাস্টার শুনে ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করলো আসামী। কুড়িবছরের শশী আর চৌদ্দবছরের চামেলীকে জেরা করতে, চামেলী হাসলো লজ্জা পেয়ে। গোপীনাথ রায় দিলো বিয়ে করুক শশী।

সার্কাসের মধ্যেই বিয়ে। এ তাঁবু থেকে ও তাঁবু। শশীর মা গয়না দিয়ে বৌ সাজিয়ে আনলো। সেই থেকে শশীদের সঙ্গে প্রেমতারার ভাব বেশী।

রাউটি শেষ হতে চামেলী বলে,—আজ আমার ঘরে খাবি, জানলি তারা? মেসবাবুকে বলে আয়। মা ডেকেছে তোকে।

চামেলী আর শশীর তাঁবু হলো 'ফ্যামিলি তাঁবু'। প্ল্যাটফর্মে বিছানা গোটানো। সাইকেল, কস্ট্যুম, জুতো ছড়ানো ইতস্ততঃ।

আজকের বাঁধা ঘর কাল গুটোবে শশী। তবু তাঁবুতে ক্যালেণ্ডার টাঙানো। চামেলী আর শশীর বিয়ের ছবি ছোট টেবিলে রাখা। পেছনে রান্নার কুঠরী।

শুধু খাওয়ার নেমন্তন্ন নয়। কথা আছে। গুরুতর কথা। চামেলীর সঙ্গে হাতে হাতে প্রেমতারা রান্নাটা এগিয়ে নেয়। মাংস ভাজে। চাল ধোয়। ঘাসের ওপর তেরপল ফেলে দিয়ে খাবার জায়গা হয়।

খাওয়া চুকলে রাজুকের তাঁবুতে ছেলে মেয়ে পৌঁছে দিয়ে আসে চামেলী। বলে,—তাতে বেরুতে দিস্‌নি, মেরী।

ফিরে এসে বলে,—মেয়েটা বড় হচ্ছে আর বুদ্ধি বাড়ছে! কথাটি কানাকানি করে দেবার একজন! মাস্টারকে বলে দেবে।

—তো কি হবে? মাথা কেটে নেবে মাস্টার?

চোখ সরু করে পানের ডগায় চুন খায় প্রেমতারা। মাসী বলে, —মাস্টারকে ভয় করিসনে তাইতো তোকে ডাকলাম, তারা। ছুটো কথা কইতে হবে। কাজ আছে তোর। লিভিং-ফাউণ্টেন বিমল পার্শী-সার্কাসে যেতে চাইছে। মেহেরানসায়েবের সঙ্গে কথা হয়েছে। সেটিতে বাগড়া দিতে হবে।

প্রেমতারা বলে,—সে মেহেরান আর গোপীমাস্টার বুঝবে অখন। তোমার আমার কি গো মাসী? যার গুড়ে মিষ্টি বেশী সেই মাছি ধরবে। রাখতে চায় তো টাকা বেশী দিক্‌না কেন গোপীমাস্টার?

—শুধু তো তাই নয়। এদিকে কিরণকে যে ভাসিয়ে যাচ্ছে বিমল?

সে আবার কি? গালে হাত রেখে মূর্ছা যায় তারা।

চিরকাল পষ্ট কথা কয়েছে চামেলী। আজও কাটা-কাটা বলে, —আকাশ থেকে পড়লি যে তারা? কিছুই জানিসনে? বলি, মন তোর কোথায় ছিল?

—সিংহ পুষতে নেশা লেগেছে।

শশীর গলা নিচু। চোখ হাসছে। গলায় কোনো ঠাট্টা নেই। মাসী এসব কথা কানে নেয়না। বলে,—তোরা হাল্‌কো কথা তুলিসনে। সকল সময়ে বট্‌কেরা কাটিসনে বৌ। তারা, মাস্টারকে বলে হোক আর ঝা করে হোক, তুই বিমলকে রাখ্। কিরণ মরে যাবে।

—আজ রাউটিতে তো আসেনি কিরণ ?

—গতর তুলতে ক্ষ্যামতা আছে ? কাল মারেনি মাস্টার ? রাতের বেলা কিছু শুনিসনি কো ?

এত কাণ্ড কিরণকে নিয়ে ? কিরণ হলো মাস্টারের প্রাইভেট লোক। এ এক আশ্চর্য রীতি সার্কাসের দুনিয়ার। গোটা সার্কাসটাই মালিকের। তবু তারা আলাদা একটা ছোটখাটো দল রিজার্ভে রাখে। অনেক সময় এই বিচিত্র জীবনের গতিপথে কিছু ছেলে মেয়ে এসে পড়ে যারা সত্যিই বেওয়ারিশ। আবার কারুকে স্বেচ্ছায় দিয়ে যায় বাপ মা। বেচলাম, এ কথা তারা বলে না। আবার, কিনলাম এ কথাও শোনা যায় না। ক'খানা নোট হাত বদল হয়। বাপ মা চোখের জল মুছে ভাবে যাহোক দুটি খেতে পাবে। ঘরে গিয়ে দু'দিন গড়াগড়ি ক'রে মাটিতে বুক ড'লে কেঁদে নেয়। আবার কাজে লেগে যায়। গোড়ার কারণটা মর্মান্তিকভাবে সত্যি। ক্ষিদে, পেটের জ্বালা। এ জ্বালা জ্বলছে রাবণের চিতার মতো অনির্বাণ। পৃথিবীতে ছোট বড় অনেক কাজই এই জ্বালার কারণে ঘটছে। 'ক্ষিদের আগুনে জ্বলে এ কাজ করিছি'—এ কথা বললে আর কিছু বলবার নেই। পাপ-পুণ্যের কথাও ছোট হয়ে যায়।

এমনি সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে সার্কাসের মালিক 'রিজার্ভ দল' বানায়। এসব ছেলেমেয়েরা পীকক থেকে বাঘের খেলা সবই অল্পবিস্তর শেখে। যদি কেউ কাজ ছেড়ে পালায়, এদের দিয়ে যে কোনো কাজ চলে যাবে। মালিক এদের আগলে রাখে। বলে—

'আমার ফ্যামিলির মানুষ'। এরাও মালিককে বাবা অথবা দাদা ডাকে। দলের সবায়ের সঙ্গে মেশেনা। মালিক যখন টাকা জমা দিতে যায় শহরের ব্যাঙ্কে, তখন এরা তাঁবু থেকে বেরোয়না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলে,—জানি না, মাস্টারবাবু জানে। সার্কাসের মানুষ মালিকের অসাক্ষাতে এদের খোঁচায়। নিষ্ঠুর বিদ্রূপে বলে,— এঃ, মস্ত লাট এয়েচেন! নিজে জানেনা কো, মাস্টার জানে। কেন, ডুবে ডুবে জল খেতে জানোনা? আমরা খবর রাখিনা? ন্যাকা সাজছেন!

এরা আলাদা। এদের সম্মান আলাদা। মাস্টারের পিছু পিছু ঘোরে, মাস্টারের হুকুমমতো এদের চলাফেরা, শোয়া-বসা। এইজন্য সার্কাসের মানুষ এদের হিংসে করে। আর তলে তলে বিভেদ-বিরোধের একটা চোরা খাল বইয়ে দিয়ে মনের সুখে মালিকানা ফলায় মাস্টার! এদের তরফ থেকে কোনো অবাধ্যতা ঘটলে তার প্রতিশোধ বড় নির্মম হয়।

এত কথা ভুলে বেপরোয়া হলো কিরণ। ষোলবছরের মেয়ে। চোখ নিচু করে চলে। ছুনিয়াতে কেউ নেই তার। বড় ভীতু মেয়ে। ট্রাপিজে দোল খেতে আজও তার বুক কাঁপে। বলে,— আমি মরে যাব দিদি, আমার বড় ভয় করে।

তার ওপর গোপীমাস্টারের একটা রাগ আছে। দেখতে সুবিধের নয়। খেলাতেও তেমন নয়। তবে বিপদকালে ঠেলে চালিয়ে দিতে পারে।

সে মেয়ের এত সাহস হলো কি করে? প্রেমতারা ভেবে অবাক হলো। বিমলের খেলাটিও দামী। তার কদর আছে গোপীর কাছে। রাতে বালতি-বালতি জল খাবে বিমল। সেই সঙ্গে জ্যান্ত মাছ। সেই জ্যান্ত মাছ আর জল উগরে দেয় বিমল। তাই সারাদিন জলবিন্দু খায় না। তার খেলার বড় কড়াকড়ি। খায় যা ঐ রাত বারোটার পর! এখান থেকে ওখানে চলার সময়ে, যখন শো থাকে

না। গোপী তাকে খুব খাতির করে। বলে,—যা মন নেয়, খা বিমল।

কেষ্টবাবুও খাওয়ায়। বলে,—কত পয়সার খাবি, খা। মাছ, মিষ্টি, সন্দেশ, মাংস। খর্চ করতে আমি পশ্চাৎ নই।

বিমলের চেহারা আছে। রোজগার আছে। সার্কাসের যে-কোনো মেয়েই খুশি হয়ে বিয়ে করবে বিমলকে। প্রেমের গতিবিধি একান্ত জটিল। নইলে এ প্রেম হওয়ার কোনো কথা ছিল না।

প্রেম-ই দুঃসাহসী করেছে কিরণকে। অনেক রাতে চুপি চুপি উঠে গিয়েছে বিমলের তাঁবুতে। মাসী বলে,—

—বিমলকে আর কিরণকে ধরিয়ে দিয়েছে নাগিয়া। কিরণকে কাল রাত দুটোয় ফিরতে দেখে যা মেরেছে মাস্টার, কি বলব! আজ বিমল বলেছে চলে যাবো অন্য সার্কাসে। ওদিকে মেয়েটার কি হবে? ভেসে যাবে?

প্রেমতারা অবাক হয়েছে বলেই আবারও প্রশ্ন করে অবুঝের মতো,—এখন আর ভুলবে না কিরণ? কেঁদে-কেটে নয় উতলা হলো। পরে মেনে নেবে না? নাকি তা অসম্ভব?

—ভেসে যাবে লো, ভেসে যাবে। কিরণ যে একেবারে মরেছে!

প্রেমতারা আরো অবাক—এত সাহস হলো কিরণের? ঐ তো পাটের পুতুল, টুস্‌কি দিলে মুস্‌ড়ে পড়ে। অনেক দেখেশুনে অভিজ্ঞ হয়েছে মাসী। বলে,—দেখ্‌ তারা, ভীতু মানুষ যখন সাহসী হয়, তার আর কোনো বাছ-বিচের থাকে না—ভয় সে একেবারেই হারায়।

প্রেমতারা উঠলো। কোঁকড়া চুলের রাশ টেনে-টেনে জাপানী খোঁপা বাঁধলো। কাপড় পরলো গুছিয়ে। ছোট ফুল-কাটা আয়নায় মুখ দেখে বললো,—

—মাসী, ঘটকেলী পাকা হলে কিন্তু বিদেয় চাই।

পেছন ফিরে ছেলেকে দুধ দিচ্ছিল চামেলী। বললো,—তোমার বখশিশ আমার হাতে আছে। অত গর্ব করোনি।

—তোর সতীন হতে ডাকিসনি, চামেলীদিদি। বয়ে গেছে আমার !

—ওলো, বর্তে যাবি।

দুজনেই হাসলো।

এটি তাদের পুরোনো রসিকতা। তার পর বেরুলো প্রেমতারা।

দুপুর রোদ ঝিলিক দিচ্ছে। মাস্টারের তাঁবুতে পর্দা ফেলা। মাস্টার খাতাপত্তর দেখছিলো। পায়ের কাছে বসে মুখ দেখলো প্রেমতারা। এখন বেশ হাসিখুসী। বললো একটা দরবার করতে এলাম মাস্টার।

—কিসের দরবার ? আর্জি আগেই মঞ্জুর করলাম আমি।

—রাখতে তুমি, মারতেও সেই তুমি-ই। আমাদের তো অপর কেউ নেই। কথাটি ভয়ে বলি না নির্ভয়ে বলি মাস্টার ?

—তোমার গলায় নতুন কথা ? প্রেমতারা অবাক করলে তুমি। কত রঙ্গই জানো !

কৌতুক ছেড়ে আন্তরিক মিনতিতে গোপীর পা চেপে ধরলো প্রেমতারা। —দুটো জান মরে যায় মাস্টার—বিমলকে তুমি যেতে দিয়োনা !

উঠে বসে মাস্টার। ঘাসে হাঁটু গেড়ে বসেছে প্রেমতারা। দুজনে খুব কাছাকাছি। প্রেমতারার মুখ তার মুখের বড় কাছে। মাস্টার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকে। বলে,—বিমলের জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন ?

গলা নিরুত্তাপ। তবু প্রেমতারা বোঝে তলে তলে চটেছে মাস্টার। ভয় করে। তবু বলে,—কিরণ মরে যাবে মাস্টার।

—কিরণের নাম আমার কাছে কোরোনা প্রেমতারা। পথের কুকুরকে নাই দিলে এমনি করেই মাথায় ওঠে।

—মাস্টার, তবু তোমার মানতে হবে। ওদেরকে বে দিতে হবে।

—বে দিতে হবে ?

গোপীনাথের শরীরের সান্নিধ্যে প্রেমতারাও গরম হয়ে উঠেছে। এ বড় ভীষণ জ্বালা। বুনো, বর্বর রক্ত কিছুতে শাসন মানে না। ভাঙা-ভাঙা বসা গলায় প্রেমতারা বলে,—

—না দিলে কলঙ্ক হবে আমাদের। কিরণ তো আর একা নেই মাস্টার?

মেয়েদের কলঙ্কের কথা। নির্লজ্জ হয়েই বলে প্রেমতারা। নইলে উপায় কি? গোপীমাস্টার এবার বোঝে। বলে,—অ!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। গোপীনাথ সামলে গিয়েছে বড় জোর। প্রেমতারা বোঝে গোপীনাথ ব্যবসার দিকটা ভাবছে। উস্‌কানি দিয়ে ন্যাকার মতো সহজভাবে বলে,—

—বিমলই যে বেশী নেমকহারাম গো! খেলাটি নিয়ে চলে যাবি? মায়ের দয়া হলো যখন ফরিদপুরে, তখন তুমি যে কত করলে? এমনি করেই কি ভোলে? আর মেয়েটাকে ফাঁসিয়ে এখন অন্য দলে যাবি। কেচ্ছা যা হবে হোক আমাদের, কেমন? না মাস্টার, সার্কাসকে ভালবেসেছি নিজের মতো। এত অশৈলী ঝ্যানো সইতে পারি না।

এসব কথায় মনে মনে খুসী গোপীনাথ। কিন্তু খুসী প্রকাশ করতে চায় না। পাছে পায়াভারী হয় প্রেমতারার। গলাটা অনাবশ্যক মোটা করে বলে,—

—তুমি এসো প্রেমতারা। যা হয় করবো অখন আমি আর কেষ্ট। বলে গেলে, শুনে রাখলাম। নেয্য বিচারই হবে।

—বাঁচালে মাস্টার। মনটা যেন কেমন হচ্ছিলো। বলি, যাই পা ধ'রে কেঁদে পড়িগে। মাস্টার ঠেলবে না কো।

যত খুসী গোপীনাথ, গলা তত ভারী।—এবার তুমি এসো প্রেমতারা। দুপুরবেলা আসা তোমার উচিত হয় নাকো।

—আর ভুল করবোনা গো। দোষ হয়ে গিয়েছে।

—কেষ্টকে একবার ডেকে দে যেয়ো।

হাসতে হাসতে কেষ্টবাবুর তাঁবুতে গেল প্রেমতারা। কেষ্টবাবুর ফ্যামিলি-তাঁবু। মেয়ে কোলে 'মিলন-মন্দির' পড়ছিলো বৌ। মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া জানা বৌ। তার কদর অনেক। প্রেমতারা বসলো। —কেষ্টবাবু কই বৌদি?

—নাইতে গেছে। বোসো।

—বস্‌বনি। একবারটি ডেকেছে মাস্টার। তাঁবুতে এলে পাঠিয়ে দিয়ো। এত দেরিতে চান?

—ঘোড়ার ডাক্তারের কাছে গেছলো। গরম পড়েছে। কেমন যেন করছে ঘোড়া।

—সেই সায়েবের ঘোড়া?

—হ্যাঁ গো। কুকুরে কামড়েছিলো বলেই না পঞ্চাশ টাকায় ঘোড়া দিয়ে দিলো সাহেব। আসলে ক্ষেপে যাবে বলে ভয় ছিলো সায়েবের।

—নেওয়া উচিত হয়নি কো।

—বলবে কে বলো?

কেষ্টবাবুর তাঁবু থেকে বেরিয়ে নিজের তাঁবুতে চলতে কি মনে হলো প্রেমতারার, মনোহরের তাঁবুতে ঢুকলো। মনে কিছু ছিলো না, শুধু চোখে দেখতে একটা বাসনা হলো। কিন্তু ঘরে নেই মনোহর। কোথায় গেছে এই ভরদুপুরে?

তার তাঁবুর পাশেই মেয়েদের ঘর। কিরণ, মীরা, গোলাপ, কুসুম থাকে। তার পাশের ঘরে আগুন নেভাবার বালতি, মই, বা পেইন্ট এইসব থাকে। সে ঘরে কার সঙ্গে কথা কইছে মনোহর? উঁকি দিয়ে দেখে অবাক হলো প্রেমতারা। এ মানুষের কি সবই আশ্চর্য? নাকি দুনিয়ার নিয়ম সে বোঝে না, মানে না?

আঁচল দাঁতে কামড়ে দড়িদড়ার ওপরে বসে আছে কিরণ। তার পায়ে ওষুধ দিচ্ছে মনোহর। তুলো দিয়ে মলম লাগাচ্ছে আস্তে আস্তে। ছোট ছোট কথায় সান্ত্বনা দিচ্ছে। আবার দুঃখও করছে।—দুঃখ

কোরো না বোন, বলে মানুষের রাগ, রাগলে মানুষ হয় বাঘ। মানুষ কি স্ববশে ছিলো? মনের ঝালে করেছে এরকম। কালি হয়ে গিয়েছে অঙ্গ, অ্যাঁ? রক্ত ফেটে বেরিয়েছে।

মাস্টার শাস্তি দিয়েছে কিরণকে। আর ভরদুপুরে তাকেই তোয়াজ করছে মনোহর। বাজে বেফাঁস কথা দুটো-একটা উঠলে মনোহরকেই ক্ষমা করবে না মাস্টার। কিরণ-ই যে আরো মার খাবেনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর এই মানুষই বা কি রকম?

কবে কিরণ তার বোন হলো। কবে এত নিকট হলো মনোহর? সে ছাড়া অন্য মেয়ের সঙ্গেও মনোহর এমনি কথা কয়? ক্ষণিকের জন্যে যেন হিংসে হলো প্রেমতারার, তারপরই দেখে নিলো বাইরেটা। কয়জোড়া চোখ আর কান আছে, শুধু পরের দোষ দেখে, পরের কথা শোনে। তারা পরের বিপদ ঘটাতে তৈরী। গোপীমাস্টারের তারা বিশ্বাসী লোক। এদের কথা ভেবে ব্যস্ত হলো প্রেমতারা। বললো—

—মনোহর!

—কেন গো প্রেমতারা?

—ওষুধ আমি দিচ্ছি, তুমি যাও।

—এতক্ষণে দেখবার সময় হলো? মেয়েটা যে মরে যায়। তোমরা সব কি!

—তুমি বুঝবে না। এখন যাও দেখি? একজন দেখলে আবার দশ কথা উঠবে। আমি নে যাচ্ছি কিরণকে।

—পিঠেও মলমটুকু দিয়ো।

প্রেমতারা দেখতেই নরম-সরম, গায়ে তার অনেক জোর। কিরণকে নিয়ে নিজের তাঁবুতে বিছানায় শোয়ালো। পিঠে আর পায়ে মেরেছে মাস্টার। জামা খুলতে লম্বা দাগগুলো নজরে পড়লো। ওষুধ দিলো প্রেমতারা। বললো,—জ্বলে নাকি রে?

—তেমন নয়, দিদি।

—কেমন আছিস এখন?

—মনের ভিতরটা পোড়ায় দিদি। হুতাশে পোড়ায়।

—মাস্টারকে আমি বলেছি, কিরণ। আজকের দিনটা ছাখ্।

—সে তো থাকবো না, দিদি।

—দেখা যাবে। চলে যাওয়া অমনি সস্তা, না?

—কি জানি! আমার খালি ভয় লাগে ভরসা পাই না।

তার পর শুকনো ঠোঁটটা চাটে কিরণ। বলে,—একটু জল নি দিবার পার। পিপাসা লাগছে।

—তোর জ্বর এসেছে কিরণ?

—অইব-ও বা।

পাঁউরুটি আর কনডেন্সড-মিল্ক খেতে দেয় প্রেমতারা। জল দেয়। বিনা প্রতিবাদে খেয়ে পাশ ফিরে তাঁবুর দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে কিরণ। বলে,—মনোহর মানুষটা ভালো।

প্রেমতারার মধ্যস্থতায় কাজ হলো। বিমলকে ডেকে ধমক দিলো কেষ্টবাবু। বললো,—ম্যাজিস্ট্রেট-সায়েব, দারোগা সবাই সার্কাস দেখতে আসে। বিমলকে তাদের কাছে ধরিয়ে দেবে, যদি রাজী না হয় বিমল। কিরণকে বিয়ে করতে হবে।

গোপীমাস্টার বললো,—বিয়ে করবে না? আমার এই তুই হাতে ফেঁড়ে ফেলে দেবো। আমার সার্কাসের মেয়ে নিয়ে বদমায়েসি?

বিয়ে করতে কবুল খেলো বিমল। মাইনের টাকা জমিয়েছিলো কী মতলবে কে জানে! সেই টাকা থেকে খাওয়াতে হবে সার্কাসকে।

বিমল চলে গেলে পরে ঘাসে থুথু ফেলে গোপীমাস্টার বিতৃষ্ণা জাহির করলো। বললো,—বড় চাল চালতে গিয়েছিলো। ফেঁসে গেল। এখন কোথায় যাবি যা!

কেষ্টবাবু বললো,—তুমিও যেমন! এমনিধারা ফ্যামিলি-ব্যবস্থা কোথায় পাবে? ও তোমার পার্মেণ্ট হয়ে গেল ধরে নাও।

সেদিনকার 'শো' বড় চমৎকার জমলো। পাঁচটার সময় যখন মেয়েরা রংপাউডার মাখছে, রিবন বাঁধছে, তাঁবুতে চেয়ার-সতরঞ্চি

ব্যবস্থা ঠিক—ব্যাণ্ডমাস্টার বাজনা ঠিক করছে,—কথাটি ছড়িয়ে গেল। বিমল বিয়ে করবে কিরণকে। আসছে সপ্তাহে শান্তাহারে যাবে পার্টি। শান্তাহার গঞ্জ জায়গা। টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি সেখানে। সেখানে যাবার আগেই বিয়ে হবে। এ বিয়ে ঘটালো প্রেমতারা।

প্রেমতারার কথা এত মানে গোপীনাথ? এমন একটা ব্যাপারেও তার কথা রাখল? নারকেলতেলে সপসপে চুলে বেণী বেঁধে, বাঁকা সিঁথিতে সিঁদুর দিতে দিতে চামেলী তার শাশুড়ীকে বললো—

—দেখিস্ অখন মা, মাস্টার বে করে নেবে প্রেমতারাকে।

বৌয়ের কস্ট্যুমের পেছনে হুক লাগাচ্ছিলো মাসী। মুখে একটা অবিশ্বাসের শব্দ করলো। চামেলী আয়নায় দেখে ঠোঁটে রং লাগাতে লাগাতে বললো,—তুই বিশ্বাস গেলি না তো?

—তুই বড় কানা, বৌ।

—কেন?

—প্রেমতারার চোখে মাস্টার নেইকো।

—তুই জানলি কি করে?

—চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর সার্কাসে রইছি না? মানুষ দেখে মনটি জানতে পারি।

শাশুড়ী-বৌ। কিন্তু এই যাযাবর জীবনের নিরন্তর নৈকট্যের ফলে সম্বন্ধটা বন্ধুর মতো দাঁড়িয়েছে। চামেলী তাই বললো,—হ্যাঁ। উনি সব জানেন। বিধেতা!

—সাইকেল নে যা বৌ। শশীকে পাঠিয়ে দে। 'জুতো জুতো' করে চ্যাঁচাচ্ছিলো, এই তো ছেলের জুতো!

—ডেকে দিচ্ছি। কিরণের ঘরে একবারটি যাস্ মা! জ্বর এয়েছে।

চামেলী চলে গেলে পরে তাঁবুটা ব্যবস্থা করে রাখতে রাখতে মাসী আবার হাসলো। চামেলী বড় হাবা। আবার ভাবলো,

—আমার ঐ হাবাই ভালো।

খেলার ফাঁকে ফাঁকে প্রেমতারা অনেকবার দেখলো মনোহরের

দিকে। কাজের মতো কাজ করেছে প্রেমতারা। তার একটু স্বীকৃতি কই মনোহরের চোখে মুখে? ট্রাপিজের খেলার আগে নাগিয়া বললো—

—খেলাতে আজ মন নেই প্রেমতারা? মনোহর দেখছে না? ওকে ডাকবো আমি? দেখতে বলবে?

—নাগিয়া!

—মন কোথায় গেল প্রেমতারা?

আজকে লাল-টুকটুকে সাটিনের আঁটো কস্ট্যুম। মাথায় চওড়া জরীর প্রজাপতি।। টুকটুকে ঠোঁট। ধবধবে রং। যেন পরী। দড়ির জালের পাশে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে। দড়ির মই নেমে এলো গায়ের কাছে। মইয়ে পা দিয়ে নাগিয়া বললো—

-তুমি কিরণের চেয়ে অনেক খাপসুরৎ, প্রেমতারা। তোমাকে গোপী ছাড়বেনা।

নীল চোখে ঠাণ্ডা চাউনি হেনে জবাব না দিয়ে উঠতে লাগলো প্রেমতারা। কথা কয়ে চটিয়ে দিতে চায় নাগিয়া? প্রেমতারা চটবে না। এতটুকু বিভ্রান্ত হলে মৃত্যু অবধারিত। জুয়েল কোহেনের সুন্দর শরীরটার সেই অসহায় ভঙ্গীর কথা কে না মনে রেখেছে? অপঘাত মৃত্যুতে অসহায় পড়ে আছে ট্রাপিজ কুইন?

কিন্তু ভুলে যায়নি মনোহর। প্রেমতারাকে সেদিন দেখে তার মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। সেজেগুজে নিজের তাঁবু থেকে সাইকেল নিয়ে যখন এলো প্রেমতারা, দেখে মনোহরের মনটাই খারাপ হলো। এমন রূপ যার, এমন গুণ যার, সে যে তার সঙ্গে কথা কয় এই তো ভাগ্যি। কিন্তু কতদিন আর এমন ভাল লাগে? নফর মনোহর। কতজনের নিচে তার ঠাঁই। পঁচিশ বছরের তাগড়া শরীরে রক্ত টগবগ করে। মনে হয় কত কি করতে পারে মনোহর যদি একটু সুযোগ পায়। প্রেমতারার সঙ্গে কী খেলা দেখায় নাগিয়া? সে যদি সুযোগ পায়? তবে যে কি করে মনোহর!

মনের দুঃখে সেদিন রাতে বাদশার খাঁচার সামনে গিয়ে বসে রইলো মনোহর। বিড়বিড় করে আবোল-তাবোল বকলো,—তোকে এত করে ভালো রাখছি বাদশা, এত করে খেলার কথা ভাবি। কিন্তু কি লাভ বল? তোকেও শুধু চোখে দেখারই এক্তিয়ার আমার। তার বেশী অধিকার তো নেই। ভালো লাগেনা রে বাদশা শুধু চোখে দেখতে আর ভালো লাগেনা।

—তুমি পুরুষমানুষ নও।

চম্‌কে মাথা তোলে মনোহর। বাদশা গরগর করে ওঠে। তাঁবুর দড়িদড়া খুঁটিতে বেঁধে পোঁতা। গরম কালের রাত। তাঁবুর মাথায় বাতি জ্বলছে, তাতেই আলো হয়েছে সামান্য। এই আলো-আঁধারিতে কখন এসে দাঁড়িয়েছে প্রেমতারা। জংলা-ছাপের কাপড় লেপ্‌টে রয়েছে গায়ে। কোঁকড়া চুল টেনে তুলে খোঁপা-বাঁধা। সাবান, পাউডার আর তেলের গন্ধ ছাপিয়েও একটা অন্যরকম গন্ধ তার গায়ে। দাঁড়ায় মনোহর। খালি গা। গোড়ালি থেকে গুটোনো প্যাণ্ট। সমস্ত গা দিয়ে শরীর দিয়ে এই মাটি রাত ঘাস সব-কিছুর সঙ্গে যেন মানুষটা এক। কোনো লুকোছাপা নেই। ঝাঁকড়া চুল কপালের ওপর পড়েছে। গায়ে ঘাম চিকচিক করছে। মনোহর বল্লে,—এই কথা শোনাতে এসেছ প্রেমতারা?

—তোমার শিরদাঁড়া নেই।

—রূপের গরবে অত কথা শোনাচ্ছ প্রেমতারা?

—অমন করে মুখ বুঁজে থাকলে কেউ কারুকে দেখেনা মনোহর।

—আমি কিরণকে ওষুধ দিলে দোষ হয়! আর এই যে তুমি এয়েছ? আমার সঙ্গে কথা কইছ? এতেও দোষ আছে প্রেমতারা। আমি নফর। তুমি প্রেমতারা। আমার সঙ্গে কথা কোয়োনা।

মনোহরের কাছে দাঁড়িয়ে এমন যে প্রেমতারা, তার ভঙ্গীতে কিন্তু দেমাক ঠাট নেই। শরীরের রেখাগুলি ভেঙে-ভেঙে পড়েছে।

ছুটো 'শো' দেখিয়ে শরীর-মনে ক্লান্ত এক সার্কাসের মেয়ে। হেলান দেয় প্রেমতারা। মুখখানা আড়াল করে। গলার স্বরটিও কোমল ক্লান্ত। সার্কাসের মেয়েরা বুঝি এই সব ক্লান্তি লুকিয়ে নিয়ে বেড়ায়? তাদের মনের হদিশ পাওয়া যায়না। তাদের কথায় মালিক ওঠে-বসে। তাদের আলাদা তাঁবু। রঙীন-রঙীন শাড়ী। তাদের ঠাঁই আলোর তলায়, বাজনার মধ্যে, হাততালির ঝড়-ওঠা তাঁবুতে। তাদেরই একজন প্রেমতারা। অথচ কেমন সংসারের মেয়ের মতোই অসহায় মেয়েলী ভাব। সার্কাসের মেয়ে হলে বুঝি তার ছুটো জীবন থাকে? মনোহরের গলায় কথা সরেনা। প্রেমতারা বলে,—যতদিন জোয়ান আছি, শুধু ততদিন কদর আছে আমার। বুঝতে পারোনা?

—তুমি এই কথা বলছ?

—তুমি যদি নফর হয়েই থাকতে চাও মনোহর, কেউ তোমায় পুছ্‌বেনা। নিজেকে অমন সস্তা ভাবো কেন? এত সহজে খুসী থাকো কেন?

—আমি বললেই মানবে মাস্টার?

—বলে দেখেছ?

—না।

ছুজনে মুখোমুখী। পঁচিশ বছরের বাঘ-পোষা জোয়ান আর কুড়ি বছরের সার্কাসের মেয়ে। রক্ত ফেনিয়ে ক্ষেপে ওঠে শরীরে। বাদশার সবুজ চোখে ঝিলিক দেয়। তাঁবুর আলোয় মনে হয় প্রেমতারার নীলচোখ যেন তাকেও লজ্জা দিয়ে ঝিলিক দিলো। তিরস্কার আর ঘৃণার ছুরি প্রেমতারার গলায়। মাস্টারকে ভয় পাও? ভীতু মানুষ আমি দেখতে পারিনা, মনোহর।

দড়িদড়া টপ্‌কে চলে গেল প্রেমতার। বাদশার খাঁচায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মনোহর, আর অনেক দূর থেকে নাগিয়ার কালো মুখখানা তার তাঁবুর জানলা থেকে সরে গেল।

বিমল-কিরণের বিয়ে পর্যন্ত মানতে রাজী গোপীনাথ। কিন্তু নফর মনোহরের আস্পর্ধা দেখে সে চটে লাল হয়ে গেলো। খেলা দেখাতে দিতে হবে? নফর হয়ে আর রইবেনা মনোহর? সে সুযোগ যদি না দেয় গোপীনাথ, তো মানুষ দেখে নিক্ সে। চলে যাবে মনোহর।

—এখন কোনো কথা শুনতে পারবো না।

মনোহরকে এক কথায় বিদায় দিলো গোপীনাথ। ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছে সে, ছট্‌ফটানি বেড়েছে মনোহরের। মনোহরের গান, স্ফুর্তি আর চন্‌মনে ভাব দেখলে যে তারিফ ফুটতো প্রেমতারার চোখে, তা দেখেও হিংসের অবধি ছিলোনা গোপীনাথের। কিন্তু তারপর থেকে আরো খারাপ লাগছে। কোনো অভিযোগ ছিলোনা মনোহরের। খুব খুশি থাকতো সে। নফর হয়ে এসেছে মনোহর। নফর হয়েই খুসী ছিল সে। তাকে এমন করে ছট্‌ফটে হতে শেখাল কে? আজ মনোহরের পা আর মাটিতে থাকতে চায়না। শূন্যে দোলা খেতে চায়। জরির জামা পরে বাদশাকে খেলাতে চায়। দেখে দেখে মরমে জ্বলছে গোপীনাথ।

কেষ্টবাবু বলে,—গেলে আর এমনটি পাবেনা। নয় দেখাতই খেলা? নাগিয়া তো উড়লো বলে। ও আমি ভাবেই টের পাচ্ছি।

—তুই বুঝবিনা কেষ্ট।

পেনসিল চিবোচ্ছে গোপীনাথ। বেরিয়ে গেল কেষ্ট। কেষ্ট তার কথা বুঝবেনা।

আসলে, বড় স্ব-বিরোধী চরিত্রের মানুষ এই গোপীনাথ। মনোহরকে খেলা দেখাতে দিতে তার আপত্তি নেই। যদি প্রস্তাবটা আসে গোপীর নিজের দিক থেকে। মনোহর নিজে বললো কেন? কেন প্রেমতারা মনোহরের কথা এমন করে ভাবে? রিং-এ মনোহরকে না দেখলে প্রেমতারার চোখে আলো ফোটেনা। মনোহরেরও দিশা নেই। প্রেমতারার দিকে এমন ভাবে ঘাড়টি ঘুরিয়ে চেয়ে রয়েছে অষ্টপ্রহর, যেন আশ্চর্য কিছু দেখছে।

গোপীনাথের মধ্যে এই সব জটিল সংঘাতের কথা কেষ্ট কি বুঝবে? কাকে কি বলবে সে? তাকে কিছুটা জানতেন ওর গুরু। বলতেন —মনটাকে ছোট করিস না। আত্মাকে উন্নত কর্। সব মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন।

বললে কি হবে। অন্য মানুষের মধ্যে যৌবন, তেজ, প্রেম দেখলে তার বুকটা যে জ্বলে তার নিরসন কি? বিশেষ করে প্রেমতারা।

মনোহর আজ মাথা তুলে ঢুকলো তার তাঁবুতে। বললো,— আমি আর নফর হয়ে রইবনাকো মাস্টার।

তুই নিজে বলবি কেন? আমি মালিক, আমি তোকে ব্যবস্থা করে দেবো। তুই খুসী হয়ে স্বীকার করবি। পঁচিশ বছরের তেজে তুই মাথা-ঝাড়া দিস কেন?

এতেই চটেছে গোপীনাথ। গোপীনাথ কি জানেনা মনোহরের পেছনে কারু নীলচোখের উস্কানি আছে?

॥ ৪ ॥

গোপীমাস্টারের দল এলো শান্তাহার। এক ঠাঁই থেকে যখন অন্যত্র আসে সার্কাস, সে চোখে দেখতেও এক শোভা। একখানা জনপদ চলেছে যেন ঠাঁইনাড়া হয়ে। সে সময়কার তাড়াহুড়ো, হৈ হাঙ্গামা, হাঁকডাকই বা কতো! সার্কাসের মানুষদের বড় রুটিন ধরে বাঁচতে হয়। এমনিধারা কড়াকড়ির দোসর ফৌজী জীবন। এখানেও অনেকটা তেমনই।

মনটা খারাপ ছিলো মনোহরের। প্রেমতারার সঙ্গে তার কথা বন্ধ। তাকে দেখেও ভাখেনা প্রেমতারা। অথচ তাকে বাদ দিলে তো এরিনাতে চলেনা। ঘাড় পেতে দায় নিয়ে নিয়ে গোপীনাথের সার্কাসে মনোহর ক্লাউনদের মতোই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বুড়ো

ক্লাউন সুকুলবাবু বলে,—বোকা, যত ঘাড়ে নিবি, তত বোঝা বাড়বে। বুঝিসনা কেন?—ইদানীং সুকুলবাবুর চোখেও পড়েছে প্রেমতারার ব্যবহার। আগে আগে মনোহরের ওপর তার নজরটা সকলের মতো সুকুলবাবুও দেখেছিলো। আবার কি হলো কে জানে! মনোহরের হাত থেকে দড়ি ধরে নিয়ে দোলনায় ওঠে প্রেমতারা। একটার পর আর-একটা সাইকেল, সে-ও ঐ মনোহরই এগিয়ে দেয়। শুধু প্রেমতারার চোখে আর সে-আলো ঝলকে ওঠেনা। মনোহর ভাবে, খেলা দেখাবার মালিক নই। আমাকে কেন পুঁছবে প্রেমতারা?

শান্তাহারে নেমে নওগাঁ-বামুনপাড়ার দিকে উজিয়ে এসে ক্যাম্প করতে তিন-চারদিন কাটলো। এ যাত্রাটা অনেকের অনেক কারণে মনে রইলো।

আসবার আগে আগেই বিমল আর কিরণের বিয়ে হলো। সার্কাসের মানুষই গায়ে পড়ে ঘর সাজিয়ে দিলো। বিছানাপত্তর, একখানা ডেক্‌চি, দুখানা থালা, একটা গেলাস, আর আয়না-চিরুনি, তেল সাবান কিছুরই অপ্রতুল রইলো না। প্রেমতারা তার সাধের টিয়াপাখী-রঙের শাড়ীটি দিয়ে দিলো কিরণকে। গোপীনাথ একটা সোনার হার আর দুইগাছি রুলি দিয়ে সকলকে আশ্চর্য করলো। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত কিরণ কথা কইতেই পারলোনা। শুধু এ-কথা কেউ একবারও ভাবলোনা এক প্রেমতারা ছাড়া, যে কিরণের কৃতজ্ঞতাটা কতখানি অর্থহীন। মাস্টারের রিজার্ভ-দলের মেয়ে কিরণ। কোন কালেও অন্য আর্টিস্টদের যুগ্যি মাইনে পায়নি। পেটে খেয়েছে, গায়ে পরেছে, আর সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে বকুনি আর মার খেয়েছে। গোপীনাথ তাকে যে এমনি করে আজীবন ঠকিয়েছে, এতে যেন কোন অন্যায়ই হয়নি। এ বড় চমৎকার খেলা। দুনিয়া-ভোর চলেছে। গতরে খেটে উপার্জন করলে টাকা। কিন্তু যখন হাতে পেলে, তখন তোমাকে বর্তে যেতে হবে। গলে পড়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। কিরণের ভাবগতিক

দেখে তাই দুঃখই হলো প্রেমতারার। মমতাও হলো এই ভেবে যে, একখানা রঙীন কাপড়, একশিশি তেল—এসব যার স্বপ্নের কামনা ছিলো, সেই কিরণ আজ একজনের ঘরনী। একখানি তাঁবুর গৃহিণী। আর একজনের কথা মনে হলো প্রেমতারার। সে মানুষের চাহিদা কম। নিজের কথা জোর গলায় জানান দিতে সাহস পায়না সে। তাকে দেখেই তো মনে সুখ নেই প্রেমতারার। শহর বদল হলো। নতুন ক্যাম্প পড়লো। এখন অবসর আছে কিছু। কিন্তু অবসরে থেকেও সুখ নেই। তার নিজের তাঁবুতে জাপানী মাদুরের চিক ফেলা। ক্যাম্পখাটে সিনারি-আঁকা সুজ্‌নি। সে বিছানায় শুয়েও চোখে ঘুম নেই এতটুকু। মনোহর পুরুষমানুষ। অথচ তার সে জ্বালা নেই, অস্বস্তি নেই। দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্য করে তুলতে ইচ্ছে নেই। দেখে গা জ্বলে যায় প্রেমতারার। সে কি কারুকে রেয়াৎ করে? মাসীকে শুনিয়ে দিয়েছে সেদিন,—বুঝলে মাসী? কাদার তালের মতো পুরুষমানুষ চোখে দেখতে প্নারিনে কো। ন্যায্য কথা কইব হ্যাঁ—গা ঝ্যানো জ্বলে যায়।

মাসী ছোট্ট করে বলেছে,—তাতে তোর কি তারা?

প্রেমতারা জবাব দেয়নি।

সেজেগুজে নীলনয়নী মাস্টারের সঙ্গে রাউটি দিয়ে বেড়ায়। আর দেখে দেখে মরমে জ্বলে মরে মনোহর।

ক্যাম্পের এক কোনায় দড়িদড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে চারটে বোতল আঙুলে নাচায় সুকুলবাবু। বুড়ো সুকুলবাবুর মুখখানা ধবলের দাগে বিশ্রী। রাতের বেলা তার রং-মাখা মুখ, বিশ্রী একটা আলগা নাক, আর কিম্ভুত গতিবিধি দেখে মানুষ হেসে গড়ায়। দিনমানে সেই মুখই অন্যরকম। দেখতে কুশ্রী অথচ ভয় করে না। দুঃখ-দারিদ্র্যের ছাপ সুকুলবাবুর মুখে পষ্ট করে লেখা রয়েছে। জীবন-সংগ্রাম যে সুকুলবাবুর কাছে কি দুঃসহ, সে-কথা মুখখানা

দেখলেই ধরা পড়ে। কখনো কেউ হাসতে দেখেনি সুকুলবাবুকে। যে মানুষটা রাতের বেলা হাজার মানুষকে হাসায়, দিনমানে তার মুখে হাসি দেখা যায় না। ব্যাপারটা অভিভূত করেছে মনোহরকে। সুকুলবাবুর হাঁপানির রোগ আছে। ফাটা ফুসফুস সর্বদা সাঁই-সাঁই করে ডাকে। বোতল নাচাতে-নাচাতে নিশ্বাস নিতে বাতাস পায়না সুকুলবাবু। মুখ হাঁ করে ঘাই মেরে নিশ্বাস নেয়। মনোহর বলে, —আপনি একটু বসে যান সুকুলদা। রেস্ট নিয়ে নিন।

সাঁই-সাঁই গলায় সুকুলবাবু বলে,—রাউটিতে রেস্টের কথা বলছিস? তোকে নিক্‌লে দেবে মাস্টার।

সত্যিকারের রেস্টের সময় বলে,—মেয়েছেলের কথা ভেবে মন খারাপ করিসনি মনোহর। ওরা ঐ রকম। শুধু খেপাতে জানে। খুসী হতে দেখেছিস কখনো ওদের? স্রেফ দাও দাও করবে। কাপড় জামা, টাকা পয়সা সর্বস্ব ঢেলে দে না কেন তুই। মোটে খুসী হবে না। নেমকহারাম।

আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে মনোহর। এত বোঝে সুকুলবাবু? বুড়ো বিড়ি খায় আর বলে,—আমি পেটে না খেয়ে পাইপয়সাটি পরিবারকে পাঠাই। ছেলে মেয়ে বে করে সংসারী হয়েছে। পরিবার তাদের নে' আছে। আমাকে গেলে পরে তিন দিন তিষ্ঠোতে দেয়না ঘরে। সার্কাসের মানুষকে ঘেন্না করে ওর। আমার অসুখকে ঘেন্না করে। অথচ ছোঁয়াচে তো নয়। বল্ তুই? তেমন হলে মাস্টার আমায় রাখতো? তিন লাথ্ মেরে খেদিয়ে দিতো না? সে কথা বোঝাবে কে? বুঝলি মনোহর, মেয়ে জাতের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছে। এই যাঃ! একটা বোতল ভাঙলি তো?

মনোহরের হাত থেকে পড়ে গ্যালারির বেঞ্চিতে ঠোকা লেগে সবুজ কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে পড়েছে। সুকুলবাবু বলে,—মরুক্‌গে যাক! আমার হাতেও অমনি হতো।

রাউটিতে প্রেমতারাকে ছাখে মনোহর চুরি ক'রে। ছোট রঙীন

গেঞ্জি আর বেঁটে জাঙিয়া পরা নিটোল দেহ। সবগুলো চুল বেণীতে বাঁধা। একচাকা, ছু'চাকা, তিনচাকা সাইকেলে ডবল ঈস্টার্ন খেলে এরিনা দিয়ে। শশীর পার্টনার হয়ে। শশীর কাঁধে হাত দিয়ে নিচু হয়ে জুতো পরে। নাগিয়া, রাজুক বা বিমলের সামান্য কথাতে চেঁচিয়ে হাসে। শোনে মনোহর। স্থকুলবাবু তাও দেখে। বলে, —শুনিস্‌নি। তোকে তাতাচ্ছে। ওরা কি সাচ্চা মনের কদর বোঝে? হিংসে জাগাচ্ছে।

মনোহর অবাক। স্থকুলবাবু গালি দেয়,—তুই ভ্যাবা-গঙ্গারাম। কেন—বেগম, শা'জাদী আর শঙ্করকে দেখিসনি?

বাঘ-সিংহের সঙ্গে মানুষের কি তুলনা চলে? গম্ভীর হয়ে যায় মনোহর। বলে,—জীবজন্তু, জানলেন স্থকুলদা, মানুষের চে' তারা অনেক ভালো।

রাউটি শেষ হলে মনোহর চলে যায় বাদশার খাঁচায়। খাঁচা ধোয়া হয়নি কেন, বা মাংসের ভাগ কম পড়লো কেন, এইসব কথা নিয়ে চীৎকার করে ঝগড়া করে। ম্যানেজার কেষ্টবাবু অবাক হয়ে বলে,—তুই একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হলি মনোহর? কল্‌জে ফেটে মরবি যে—

তাঁবুতে বসে মাছ কুটতে-কুটতে চামেলী বলে,—বাঘ-বাঘ করে মানুষটা পাগল হলো।

তার শাশুড়ী লঙ্কা বাটে আর বলে,—তুই চুপ কর্ বৌ। তুই কিচ্ছু বুঝিস না।

ওদিকে গোপীনাথের তাঁবুতে বসে রঙ্গহাসি করতে করতেই প্রেমতারা মনোহরের চ্যাচামিচি আর বাদশার গর্জন শুনতে পায়। চা-এর পেয়ালা দেয় মাস্টারকে। মাস্টার বলে,—চা-এ চিনি দিলে না?

—এই যে দিই।—প্রেমতারা অসহজ ভাবটা কাটায়। বলে,— আমার ক'মাসের টাকা বাকি মাস্টার?

—তুই মাসের।

—দিয়ো।

—নিশ্চয়।

—বালা গড়াব। কানপাশা কিনব। গলায় শেকল-হার পরবার শখ গিয়েছে, কিনব একগাছা।

—এত সাজগোজের কি আছে গো প্রেমতারা ?

—ঝা মনে নেয় করে নেব মাস্টার। ওরকম চিমটি কেটে বেঁচে কি হবে বলো ?

প্রেমতারা চলে গেলে পরেও তার এসেন্সের গন্ধে ভারী বাতাস নাক ভরে নিয়ে চিৎ হয়ে থাকে মাস্টার।

মস্তবড়ো গঞ্জ জায়গা শান্তাহার। তল্লাটে নামডাক রয়েছে। ধানবেচা পয়সা ট্যাঁকে নিয়ে জবজবে করে তেল মেখে চাষীরা এসে লাইন দেয়। বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে চেয়ারে বসে সার্কাস ছাখে। বাহবা দেয় নাগিয়াকে দেখে। সুকুলবাবুর অঙ্গভঙ্গী দেখে লুটিয়ে লুটিয়ে হাসে। বুকের ওপর গাড়ী তোলে গোপীনাথ। লোহার রড বেঁকিয়ে ফেলে। প্রেমতারা ঢোকে টুকটুকে লাল পোশাকে। সাইকেল চড়ে মেয়েরা ঢোকে—পাক খেয়ে নেয় এরিনাতে। বিমল তিরিশটা কাঁচা মাছ জ্যান্ত গিলে খায়। একবালতি জল খায়। আবার সমস্তটা উগ্‌রে দেয়। কাঁচের বাটিতে সেই মাছ লাফায়। দেখে তাজ্জব মানে মানুষ। সার্কাসের মানুষরা অমনিধারা। চোখে দেখে তাদের মনের কথা ধরা যায় না। দেখে যারা বাহবা দেয়, তারা কোনমতেও বুঝতে পারে না যে, ঐ পাহাড়ের মতো শরীর গোপীনাথের মনের ভেতরটা হিংসেয় জ্বলছে। ট্রাপিজের ওপরে যে পরীর মতো সুন্দর মেয়ে দোল খাচ্ছে—তার মনে একতিল সুখ নেই। দর্শকেরা জানেনা, তাঁবুতে বসে ম্যানেজার বৌকে ছু'বেলা শোনায়,—শান্তাহারে এসে পয়সা মিলছে বটে, তবু পার্টির অবস্থা খুব সঙীন ;

হঠাৎ টালমাটাল হয়ে গেল সব কিছু। ঝড়টা তুললো নাগিয়া।

কেষ্টবাবু সব কিছুই জানতো। অন্ততঃ আঁচ করেছিলো। তবু এতখানি আশা করেনি।

রংপুরে জুবিলী-সার্কাস উঠতে না উঠতে রঙ্গস্বামীর সার্কাস পার্টি বুকিং হলো। বন্দোবস্ত করতে মালয়ালী ম্যানেজার এসেছিলো। ভারতবর্ষে সার্কাস পার্টিতে সবচেয়ে বেশী রয়েছে অন্ধ্র ও তামিলের মানুষ। তাদের সার্কাস পার্টিও অগুন্তি। দেশের মানুষ পেয়ে নাগিয়া কথাবার্তা কইছিলো রঙ্গস্বামীর ম্যানেজারের সঙ্গে। দেখেও যেন ছাখেনি কেউ। এরকম অভ্যাস নাগিয়ার বরাবরই আছে। অন্য কারু বেলা মাস্টার খুব কড়া। কিন্তু নাগিয়ার বেলা সে কোন দোষই ছাখে না। সেখানেই কথা পাকাপাকি করেছিলো নাগিয়া।

কনট্রাক্ট নাগিয়ার সঙ্গে। একবছরের কনট্রাক্ট। ফুরোলে নতুন করে কনট্রাক্টে হয়। নাগিয়ার সঙ্গে কনট্রাক্টের তারিখ যে ফুরিয়েছে, সে খেয়ালও ছিল না কারুর।

হঠাৎ ক'রে নাগিয়ার প্রস্তাবটা তাই বিভ্রান্ত করে দিলো গোপীনাথকে। রঙ্গস্বামী-সার্কাসে একশো টাকা বেশী মাইনে দিচ্ছে নাগিয়াকে। তাই সে চলে যেতে চায়?

বিপদ বুঝে গোপীনাথ আর কেষ্টবাবু চোখে আঁধার দেখলো। এ যেন পিছনে ছুরি-মারা। বেতের টেবিল ভর্তি কাপ, ডিস, খাতা-পত্র, আয়না, ফুলদানি সব ফেলে দিয়ে দাঁড়ালো মাস্টার। টকটকে লাল হয়ে গেল ফরসা মুখ। বললো,—পোস্টার পড়ে গিয়েছে। শো হয়ে গিয়েছে চার দিন। এখন এ কথা বলার মানে?

—আমি চলে যাবো।

—তুমি যেতে পারো না।

—কনট্রাক্ট-এর তারিখ চলে গিয়েছে। তখন তুমি কেন হুঁশ করলে না মাস্টার?

নাগিয়ার মুখখানা যে কতখানি কুৎসিত, তা যেন এতদিন তাকিয়ে দেখেনি গোপীনাথ। দেখে নিষ্ফল ক্রোধে মাথাটা জ্বলতে লাগলো। তবু গলাটা সংযত করলো। বললো,—শান্তাহার-সীজনটা হয়ে যাক। আমিও একটা মানুষ দেখে নিই।

—আমাকে পরশু যেতে হবে। রমন তার করেছে।

—তুমি শান্তাহার বুকিং-এর আগে বললে না কেন?

কথা না কয়ে শিষ দিলো নাগিয়া। নিঃসন্দেহে খুব মজা লাগছে তার। বললো,—ঠিক একমাসের টাকা বাকি রয়েছে আমার। কবে মাস্টার?

ক্ষেপে উঠে নাগিয়ার শার্টের কলার ধরে টুঁটিটা ঝাঁকালো মাস্টার! বললো,—চোট্টামি করছো বেইমান শা—, তোমাকে আমি ফেঁড়ে ফেলে দেবো।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে নাগিয়া মরেই যেতো সেদিন, যদি না কেষ্টবাবু ছাড়িয়ে দিতো তাকে। চ্যাচাতে সুরু করলো নাগিয়া তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে,—আই উইল সী ইউ মাস্টার। দেখে নেবো আমি। আমার নাম নাগিয়া! টাকা দিয়ে দাও আমাকে। স্টেশানে গিয়ে থাকব আমি।

অনেক দিন নাগিয়াকে ভয় করে-করে চলেছে মাস্টার। রাউটি, খাবার তাঁবু—সব সময় নাগিয়া সুবিধে নিয়েছে। এই নাগিয়াকে খুসী রাখতে গিয়ে সমস্ত পার্টির বিশ্বাস খুইয়েছে একদিন গোপীনাথ। আজ সেই পোষা সাপই ফিরে তাকে ছোবল দিলো। রাগে দিশা-হারা হলো গোপীনাথ। তাঁবুর সামনে বেরিয়ে এলো সেও। তার সে চণ্ডমূর্তি দেখে প্রমাদ গণলো সবাই।

—নিকালে হিঁয়াছে বেইমান!

এমন এক হাঁকার দিলো মাস্টার যে, দূরে খাঁচায় বাঘ-সিংহ-গুলো নড়েচড়ে উঠলো। এতদিন সকলের ওপর দাপট দেখিয়ে আজ নাগিয়ার এক কথায় হার স্বীকার করতে বাধলো। টাকা

দেয়া-নেয়া নয়। হারজিতের প্রশ্ন এসে গিয়েছে। সে বললো,—এক কথায় চলে যাবে? নট্ সো ইজি মাস্টার। আমার টাকা দাও।

—কিসের টাকা?

—হোয়াট? আমার পাওনা টাকা?

—দেব না টাকা। কেস্ কর্‌গা—যা। সুকুলবাবু! উল্লাস!

নিজের নাম যে উল্লাসচরণ বেরা, তা যেন ভুলেই গিয়েছিলো ক্লাউন সাম্বো। হোঁচট খেয়ে এসে দাঁড়ালো সামনে। মাস্টার বললো,—ওর যাবতীয় জিনিসপত্র বের ক'রে দাও গে যাও। সুকুল-বাবু আপনিও যান। কস্ট্যুম চেক করে নিন গে।

চেঁচিয়ে গালি দিতে দিতে চলে গেল নাগিয়া। কেষ্টবাবু গোপী-নাথকে বললো,—কিছু টাকা দিয়ে দিলে পারতিস্ গোপী। তোর সই-করা কন্‌ট্রাক্ট রয়েছে।

—যা মন নেয় করুক্‌গে। দোবনা টাকা। কম করিছি শালার জন্যে?

—তবু।

—তুই ভয় খাস্‌নি কেষ্ট। অমন পায়রার কল্‌জে নিয়ে আর পার্টি চালাতে হয় না। করবে কি?

—মনোহরকে চান্স দিলে হয় না?

—দোব। সাতদিন তো এলেম বুঝতে যাবে। সাতদিন কি করি বল্ দিখিনি?

—তুই ঠেকা দে।

—পারি না। হাপ্‌সে যাই। বেশী নম্বর আর করতে পারিনা।

—তবু।

—তাই করতে হবে। তুই মনোহরের সঙ্গে কথা ক'।

কেষ্টবাবুর সঙ্গে অনেকদিনের বন্ধুত্ব গোপীনাথের। মনের কথা কইতে মানা নেই। চোখে চোখে চেয়ে হাসতে লাগলো কেষ্ট। বললো,—প্রেমতারার মনটিও শান্তি হবে। বড় ভাবতে সুরু করেছিলো।

গম্ভীর হলো গোপীনাথ। বললো,—এ কথা বললি কেন?

—এমনি। তবে মনোহর মানুষটা ভালো।

এমনি করে সার্কাসে বহাল হলো মনোহর। মাইনে হলো একশো। টিনের চেয়ারে মনোহরকে বসিয়ে কথাবার্তা কইলো গোপীনাথ। আর্টিস্টের সঙ্গে কথা বলে-কয়ে নিতে হয়। মাইনে ঠিক হতে কাগজে লেখাপড়া হলো। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তার জন্যে দায়ী একলা মনোহর। মাস্টারের কোন দায়িত্ব নেই। এই খতে ছাপ দিলো মনোহর। এই কথাটি ভালো করে বুঝিয়ে দিলো কেষ্টবাবু। সার্কাসের মানুষ মৃত্যু নিয়ে নিত্য খেলা করে। মরণকে তারা ভয় করেনা। তার কারণ এই নয় যে, সার্কাসের মানুষ খুব নির্ভীক বা তারা মস্তো বাহাদুর। মরণের ভয় করলে চলেনা তাদের। সে ভয়ের শেষে কোন ভরসা দেবার মানুষ নেই। তাই তারা ভয় করে না। মনোহরের মতো যারাই সার্কাসে খেলতে আসে, তারা প্রত্যেক দিনই মৃত্যুর সঙ্গে মুলাকাৎ করছে। ট্রাপিজ খেলতে-খেলতে হিসেবে এতটুকু ভুল করেছিলো মাস্টারের বৌ জুয়েল। গোয়ানিজ ব্যাণ্ড-মাস্টারকে ভালবেসে বেপরোয়া হয়েছিলো। নেটের ওপর ঝাঁপ দেবার সময়ে সুন্দর শরীরটি বেকায়দায় হেলে পড়েছিলো। শেষ হয়ে গেলো খেলা! এমনি করে ট্রাপিজ, সাইকেল, মোটর-জাম্প, মরণ-গ্লোব—কি খেলায় কি রাউটিতে সার্কাসের মানুষকে মরণ নিয়ে লোফালুফি করতে হয়। তবে সে খেলা জমে ওঠে, তবে দর্শকরা হাততালি দেয়। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ঘুরে ঘুরে আসে আর্টিস্ট, তবে সে মেডেল পায়, প্রশংসা পায়। দর্শকরা এত কথা বোঝে কি? বোঝেনা। সার্কাসের মানুষের মুখের হাসি, পোশাকের বাহার—এই শুধু দেখে দর্শকরা। কিন্তু মৃত্যু সর্বদা ফেরে আর্টিস্টের সঙ্গে সঙ্গে। পাশে পাশে। ট্রাপিজ মানেই তরুণ আর্টিস্ট। তার কারণ ক-জন ট্রাপিজ আর্টিস্ট আর পাঁচ দশ বছর টেঁকে?

সার্কাসের জীবনে গোপী ত' কম দেখেনি। কতবারই দেখেছে মোক্ষম খেলোয়াড়, মৃত্যুর খেলা কি চমৎকার অতর্কিতে জমে ওঠে! নিজের জীবনেই তার মনে আছে, বুকে তুলেছে হাতী। কি খেয়াল হলো, হাতী আর নামতে চায় না। দম বন্ধ হয়ে বুক ফেটে মরে গোপী। কান দিয়ে বুঝি বা রক্ত ছুটে যায়! অনেক কাণ্ড করে নামলো হাতী। কিন্তু গোপী গেল হাঁসপাতাল। গোপী ভাল করে জানে যে সেদিন মুহূর্তের জন্যে মৃত্যু তার কাছে এসেছিল।

আর্টিস্টও আছে, তার মৃত্যুও আছে অপেক্ষা করে। কখন যে এসে যাবে পরোয়ানা, বুঝতে হলে বেশ শুদ্ধচিত্ত আর মনের তপস্যা থাকা দরকার।

এক এক দিন এক এক আর্টিস্ট বুঝতে পারে। যেমন বুঝেছিলো গোপীনাথের পুরোনো দলের আয়রন-ম্যান অনন্ত দত্ত। সাদা পাঁঠা বলি দিয়ে বিপ্লবী দলে ঢুকেছিলো অনন্তবাবু ছোটবেলা। পরে শরীরচর্চা করতে করতে বাঙালী সার্কাসে ঢুকে গেল। বুকের ওপর হাতী তুলতো। চার মন বারবেল ওঠাতো। বাঙালী ছেলের কৃতিত্ব দেখে বাঙালী দর্শকের বুক দশ হাত হতো। ইংরেজ দর্শকরা মুখে বাহবা দিতো। মনে প্রমাদ গণতো। সার্কাস-দলের পেছনে লাগাতো টিকটিকি। মাস্টারের পরিষ্কার মনে পড়ে ফরিদপুরে চাঁদমারির মাঠে স্বদেশী মেলা হচ্ছে। বুকে মা-কালীর ছবি ঝুলিয়ে মুকুন্দদাস যাত্রার আসরে নাববেন জেনে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসেছে। গোপীর বয়স তখন চোদ্দবছর। শহরে জোর গুজব—পুলিশে মুকুন্দদাসের যাত্রা বন্ধ করে দেবে। গোপী সকলের নেকনজরে ছিলো। সেদিন সকাল থেকে মেঘ জমেছে। গুরু-গুরু দেয়া ডাকছে। গোষ্ঠবাবু সার্কাস-মাস্টার। গোপীকে সোনার চোখে দেখতেন। তাঁর ঘরে বসে আছে গোপী। অনন্তবাবু ঢুকলো। সাতাশবছরের জোয়ান। কালো রং। বাবরী চুল। পাহাড়ের মতো শরীর। বলল,—গোষ্ঠদা, আমি আজ নামবোনা।

—কেন ? শরীর খারাপ করেছে ?

—আজ এরিনায় নামলে আমি আর ফিরবোনা। আমার মন জানাচ্ছে।

—ভয় পেয়েছিস অনন্ত ?

—ভয় নয়। নিশ্চয় জানলাম।

—সুরু হতে এক-ঘণ্টা বাকি। এখন এ কি বলছিস অনন্ত ?

অনন্তবাবু আর গোষ্ঠমাস্টারের মধ্যে কথা হলো। গোপীকে বের করে দোর বন্ধ করলো অনন্ত। অনেক কথা হলো। বেরিয়ে এসে অনন্তবাবু ড্রেস করতে গেলো। বাঘছাল-ছাপা জাঙিয়া পরে গায়ে ভস্ম মেখে গুরুদেবের ছবিকে নমস্কার করলো। হাসতে হাসতে অনন্তবাবু গোষ্ঠবাবুকে বললো,—আমার সোনার মেডেল ক'টা, আর তোমার কাছে যে ছুশো টাকা রেখেছি সব কালেক্টরির ক্লার্ক মদন পালিতকে পৌঁছিয়ে দিয়ো গোষ্ঠদা! ওরা চাটগাঁর জন্য টাকা তুলছে। চাটগাঁ-এ অনেক টাকার দরকার হবে।

—চুপ কর্ অনন্ত। বারবেল তুলিস্‌নি আজ। মনটা ঠিক নেই যখন।

আসরে নেমে অনন্ত দত্ত সেদিন অপূর্ব খেলা দেখালো। হাতি তুললো। মোটর রুখলো। দাঁতে কামড়ে মানুষ-বোঝাই বেঞ্চ তুললো। তারপর আনলো বারবেল। ছুই মন থেকে সুরু করে। চারমন অবধি তোলে। সেদিন সাড়ে চারমন অবধি তুলবে বলে ঘোষণা করলো। গম্‌গমে এরিনা। ছুই হাজার দর্শক। গোষ্ঠ-মাস্টার মানা করতে পারলোনা। সকলের মুগ্ধ চোখের সামনে সমস্ত রেকর্ড ভেঙে বাঙালী ছেলে অনন্ত দত্ত সাড়ে চারমন বারবেল তুললো,—দেখুন, বাঙালী কারু থেকে পিছিয়ে রয়েছে ?

লাল-ভেলভেট-মোড়া চেয়ারগুলো ভর্তি শুধুই সাহেব আর মেম। সময়টা খারাপ। সবে চাটগাঁর জালালাবাদ পাহাড়ে সূর্য সেন, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তীর লড়ায়ের খবর চালু হয়েছে। টেগরার নাম ফিরছে মুখে মুখে। 'বাঙালী' এই কথা শুনে আর

অনন্ত দত্তর দিকে চেয়ে সাহেবদের মুখ লাল হলো। অনন্ত দত্ত বারবেল তুলে দাঁড়িয়ে রইলো পুরো তিরিশ সেকেণ্ড। মুখে অল্প-অল্প হাসি। হাততালির ঝড়। তারপর প্রথমে পড়লো বারবেল। হাত থেকে বুকে। সেখান থেকে মাটিতে তারপরে পড়লো অনন্ত দত্ত। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বেরুলো হু-হু করে। শেষ হয়ে গেল একখানা সাতাশবছরের জীবন! বাঙালীজাতির গৌরব।

এইসব মানুষের সাহচর্য পেয়েও গোপীনাথ মনেপ্রাণে বাড়তে পারেনি। দেহটা বাড়লো। প্রবৃত্তিগুলোও বাড়লো। কিন্তু এইসব মানুষের মহত্ত্ব নিজের মধ্যে নেবার যোগ্যতা তার হ'লো না কখনও।

মনোহরকে গোপীনাথ তাই ব্যবসাগত দিকটা বোঝালো। বললো,—সার্কাসের মানুষের ইনসিওর হয়না। কোম্পানি-ও কোন ঝুঁকি নেয়না। বুঝে-শুনেই আসবে তুমি।

টিপ-ছাপ দিলো মনোহর। সে মনোহরচন্দ্র দাস, যশোর জেলার ঝিনাইদ-নিবাসী স্বর্গত রাইচরণ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বয়স ছাব্বিশ। নিজে টিপ-ছাপ দিয়ে কবুল খাচ্ছে যে, গ্রেট জুবিলী সার্কাসে আর্টিস্ট থাকাকালীন কোনরূপ দুর্ঘটনায় জখম হলে বা মৃত্যু ঘটলে সার্কাস-কোম্পানি তার জন্য দায়ী হবে না।

সইসাবুদ মিটলে পরে চামেলীর তাঁবু। আজ আর অনধিকারীর মতো ধীরে ধীরে নয়। গলা সংযত করে অল্প অল্প কথা নয়। চামেলীর বাচ্চাদের আদর করতে করতে, শশীকে উঁচু গলায় ডেকে ঢুকলো মনোহর। বললো,—আর্টিস্ট হয়ে গেলাম মাসী। কি খাবে বলো? মিষ্টি নিয়ে আসি?

ময়লা রঙীন কাপড়খানা ভারী শরীরে গোছ করে টেনেটুনে উঠে এলো মাসী। বললো,—তুমি কেন খাওয়াবে মিষ্টি? আগে আমার ঘরে মিষ্টিমুখ করো? বলি অ বৌ?

শশী বললো,—মিষ্টি খায় কচি ছেলে।

শশীর ইঙ্গিত বুঝে মনোহর হাসলো। বললে,—সে তোমার আমার হবে'খন ,শশীদা। রাজুক এনে দেবে। চোদ্দ আনায় ছুই বোতল। এখানে যা ফাস্‌ক্লাস নদীর ধার দেখে এইছি না ? সেখেনে বসবো। স্থকুলদাকে নে যাব।

মনোহরের পদোন্নতিতে সকলেই খুশী হলো। সার্কাসে এমনটি সব সময় ঘটেনা। চামেলীর তাঁবুতে একদিন টি-পার্টি হলো। পাঁচটায় খেলা স্থরু। চারটায় সেজেগুজে রং মেখে এলো সবাই। টাইট-পরা ছেলেমেয়েদের মাঝখানে মাসীর শাড়ীটা নেহাত বে-মানান বোধ হলো। কিরণ আনলো নিমকি। স্থকুলবাবু খাওয়ালো সন্দেশ। যে যার মতো খেয়ে নিয়ে ছুটে তাঁবুতে চলে গেলো।

কিন্তু যে দেখলে খুশী হতো মনোহর, সেই এলো না। প্রেম-তারা রইলো আড়ালে। কেন যেন লজ্জা হলো প্রেমতারার। দুঃখ-ও হলো। কেন, এতজন আছে মনোহরের ? এত আপনার জন ? জানত না তো প্রেমতারা ? আর যেই থাকনা কেন, মনোহর আলাদা ক'রে এসে বলতে পারলোনা ?

আয়নার সামনে বসে নিজেকেই শাসালো প্রেমতারা। কেন, সেই মানুষের করে এত কি প্রাণে জ্বালা তার ? সে তার কে ? প্রেমতারা কি পুরুষ মানুষ দেখেনি ? পার্শী ছেলে সিকান্দার কি কম ভালবেসে-ছিলো প্রেমতারাকে ? সে শিখিয়েছিলো, দু'দিনের জীবন, লুটে নাও।

আর সেই মাড়োয়ারীর ছেলে ? প্রেমতারাকে না রাখতে চেয়েছিল ? তখন নিজের কদর জেনেও মনটি এমন টলেনি প্রেমতারার। এবার যেন মনটা টলেছে।

আবার গোপীর কথা না ভেবেও পারেনা প্রেমতারা ! গোপী না জানি কবে রুখে ওঠে। যে মানুষ ! এমনি সাতপাঁচ ভেবে সেদিন চামেলীর তাঁবুতে গেল না প্রেমতারা।

চামেলী রেগে বললো,—দর বাড়াচ্ছে। গরবী ! অংখার হয়েছে। আজ আর শাশুড়ী-বৌয়ে বিবাদ হলোনা। কি বুঝলো

তা মাসী-ই জানে। চামেলীর কথার কোন প্রতিবাদ করলোনা। বললো,—যে যার মতো থাকুক্‌না কেন বৌ, তোর দরকার কি ?

গোপীনাথেরও চোখে লাগলো। ক'দিন আগেও মনোহরের সম্পর্কে প্রেমতারার বাড়াবাড়িটা ছিলো চোখে লাগবার মতো। চলতে ফিরতে চোখে চোখে চেয়ে হাসি, সময় খুঁজে নিয়ে তাঁবুর দড়ি ধরে কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে মস্করা করা। সময়ে অসময়ে মনোহরকে উস্‌কানি দেওয়া। অথচ যখন মনোহর সত্যিই আর্টিস্ট হলো তখন সকলেই দুই-এক কথা কইলো, শুধু প্রেমতারাই রইলো চুপচাপ। এমন চুপচাপ, যে দেখেও দ্যাখেনা মনোহরকে। অত বড় একটা মানুষ যেন চোখেই পড়েনা তার। চামেলীর মতো অন্য মানুষরাও চটলো। প্রেমতারার কাছে নানা ভাবে ঋণী সার্কাসের মানুষ। টাকা ধার নিতে, ওষুধ নিতে, ঘি-আচার-পাঁপর নিতে, মাস্টারকে দুটো কথা কইতে। আবার মনোহরও তাদের প্রিয়।

অসময়ে মনোহর রোগে সেবা করে, শহরবাজার থেকে জিনিস এনে দেয়, প্রাণ দিয়ে খাটে দরকার হ'লে। শুধু মিষ্টি কথাতেই তুষ্ট মনোহর। তার বেশী কিছু চায় না। তাই তার ওপর সকলেই খুশী। প্রেমতারার সম্পর্কে তাই শো-এর ফাঁকে ফাঁকে ছেলেমেয়েরা কথা চালাচালি করলো। এক চাকার সাইকেল চড়ে, রঙীন প্রজাপতি সেজে বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে বুলি, মীরা, গীতা, টিয়া, চন্দনা, ময়না এইসব মেয়েরা পরিমল, ননী, শশী, প্রসাদ, বাঁশী এইসব ছেলেদের দিকে চেয়ে চোখে চোখে বললো—এতদিনে প্রেমতারা বশ মানলো। হেরে গেল মনোহরের কাছে।

খেলা দেখাতে-দেখাতেই দর্শকদের দিকে চেয়ে বার বার হাসতে হয়। মাথায় গোঁজা কাগজের ফুল নাচিয়ে হেসে মেয়েরা রাউণ্ড থেকে বেরিয়ে যায়। তখন সাম্বো-জাম্বো দুই ক্লাউন উল্‌টে-উলটে দর্শকদের হাসাতে হাসাতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে,—ঝেখেনে বাইরে এতো না-দেখার ভান, সেখেনেই মরেছে সার্কাস-কুঈন।

প্রেমতারার সিংহ শঙ্কর এখন বাধ্য হয়েছে। হাতির পিঠে ওঠে শঙ্কর। তার ওপর ছাতা হাতে বসে প্রেমতারা। হাতি এরিনা ঘোরে আর নিচে দাঁড়িয়ে মনোহর রিং-কণ্ট্রোল করে। তবু কোন কথা হয় না।

ভেতরে ভেতরে কি টানা-পোড়েন চলেছে সে-কথা প্রকাশ পেতে হয়তো দেরি হতো। বাইরের এই লুকোচুরির ভাবটা বেশ কিছুদিন ধরে চলতো। কিন্তু হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটলো। তাতেই নাড়াচাড়া পড়লো।

কেষ্টবাবুর আরবী ঘোড়া ক্ষেপে গেলো। দেশী ঘোড়া নয়। অস্ট্রেলিয়ান ওয়েলার। হাজারের নিচে দাম নয়। সাহেবের কাছে থাকতেই পাগলা কুকুর কামড়িয়েছিলো। অনেক দিন কোন উপদ্রব করেনি। কেষ্টবাবু সস্তায় কিনেছিলো সার্কাসে। এবার অল্পস্বল্প গোলমাল চলছিলো অনেক দিন। সকালের দিকে ব্যাণ্ডপার্টি নতুন সুর তুলেছে। রাউটি চলেছে পুরোদমে। হঠাৎ ক্ষেপে গেল আরবী। ছোকরা সহিসকে এক চাঁট মেরে ফেলে দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে ক্যানটিনের তাঁবুর সব-কিছু উলটিয়ে তাণ্ডব করে নেচে বেড়াতে লাগল। ক্ষুরে ধুলো উড়ছে, নাক মুখ দিয়ে ফেনা পড়ছে, চোখের চাহনি ভয়ানক। যে যার মতো এরিনার ভেতরে এলো হুড়মুড় করে। বাচ্চা সহিসটার সাহস আশ্চর্য। পায়ের মাংস ঝুলে পড়েছে। রক্ত পড়ছে ঝরঝর ক'রে। তবু হোঁচট্ খেতে খেতে এলো ছুটে।—মাস্টার! মাস্টার! আরবী পাগল হয়ে গেল মাস্টার।

নিজের তাঁবু থেকে রিভলবার নিয়ে ছুটতে-ছুটতে এলো গোপীনাথ। প্রথম গুলিটা চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে গেলো। দ্বিতীয় গুলি লাগলো কানের নিচে। ধ্বসে পড়লো আরবীর চমৎকার দেহটা।

আত্রাই নদীটি চমৎকার। ছোট, খরস্রোত, নির্মল জল। তার দুইপাশে ঢালু ঘাসের জমি। ধনী জোতদার গোলমিঞার কাছ

থেকে দশহাত জমি খরিদ করলো গোপীনাথ। কবর দিলো আরবীকে। এমনিতে খেলা দেখাতে-দেখাতে যদি বুড়ো হতো আরবী, তবে তাকে ছেড়ে দিতো মাস্টার। চ'রে খেতো। অথবা না খেয়ে মরতো। কাজ ফুরিয়ে গেলে আবার কে কার খোঁজ রাখে!

ভাগ্যে পাগলা কুকুর কামড়েছিল আরবীকে! ম'রে বেঁচে গেল আরবী।

সার্কাসে আরবীও ছিলো একজন আর্টিস্ট। তার অভাবটা সকলেরই কম-বেশী মনে হলো। সহিসছোকরার যে জখমটা দেখা গিয়েছিলো পায়ে, তার চেয়ে অনেক মারাত্মক চোট লেগেছিলো তলপেটে। সকালবেলাই হাসপাতালে তাকে নিয়ে যায় কেষ্টবাবু। ভেতরে রক্তপাত হয়ে ছেলেটা মারা গেলো রাত দশটায়। ছোকরা ডাক্তার বার বার মাথা নাড়লো। উপযুক্ত সরঞ্জাম, ওষুধ সব-কিছুরই অভাব। এমন কি বরফ পর্যন্ত মিললো না এককুচি। কেষ্টবাবুর মনটা নরম। মানুষের কষ্ট দেখতে পারে না। তাই মনোহরকে সঙ্গে নিয়েছিলো। দুজনকে সাক্ষী রেখে অ-চিকিৎসার মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো ছোকরা সহিস কালু-ঘরামীর চোদ্দবছরের জান।

তবু শো হলো। সার্কাসে এমনই হয়। যারা দেখছে তারা বুঝতে পারে না। আজও তারা বুঝলো না যে, দলের মানুষ আর ঘোড়ার এই রকম আকস্মিক মৃত্যুতে মনটা খারাপ হয়েছে আর্টিস্ট-দের। বুঝলোনা যে লায়ন-মাস্টার মনোহরের চোখে বার বার কালু-ঘরামীর মুখখানা ভেসে উঠছে। সেই জন্যেই একবার বে-সামাল হলো মনোহর। আগুনের রিং-এ লাফাতে গিয়ে আঁচ লাগলো গায়ে, আর গর্জে উঠলো বাদশা। প্রেমতারা নিচু গলায় বললো,— খবরদার! সামলে!

সামলে নিলো মনোহর।

সেদিন রাতে বাদশাকে দেখেশুনে, জঙ্গীর খবরদারি শেষ ক'রে

মনোহর বাইরেই আনলো তার খাটিয়া। দড়িদড়া জড়িয়ে শালকাঠের খুঁটিটা উঠেছে আকাশপানে। তার গায়ে ঠেস দিয়ে ব'সে বিড়ি ধরালো মনোহর।

প্রেমতারা এলো সেখানে। চোখ তুলে দেখলো মনোহর। এখন সাদা পাতলা কাপড়, চুল উঁচু করে খোঁপা বাঁধা—ছিমছাম।

নানা কারণে মনটা ভাল নেই আজ। জীবনের চলমান ছন্দটাকে পরোয়া না করেই মৃত্যু এসে দেখা দিয়ে গিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে জীবন কতো অনিত্য। এইসব নানা ভাবনায় ভারি হয়ে আছে মনোহরের মন। প্রেমতারার সঙ্গে এতদিনের মনকষাকষির কথা তার মনে পড়লো না। তার বন্ধুমানুষ একজনা এসেছে, এই মনে হলো তার। বললো,—বোসো।

বসলো প্রেমতারা। বিড়িটা ঘাসের ওপর ফেলে পা দিয়ে পিষে দিয়ে মনোহর বলে উঠলো,—ধুত্তোর কিসের টান? কার জন্যে বলো? এই সকালবেলা খেলে বেড়াচ্ছিল, এখন ছাখোগে লাশ-কাটা ঘরে কম্বল-চাপা পড়ে আছে। ফুরিয়ে গেল খেলা। আরে, এই যদি খেলার রকম হয়, তবে আর কিসের জন্যে ছেঁড়া কথা নিয়ে টানাটানি করি? ভাবলে পরে, বুঝলে গো প্রেমতারা, ঘেন্না এসে যায় কারবারে, অ্যাঁ! বলো সত্যি কিনা?

জবাব দেয় না প্রেমতারা। মনোহরের কড়া-পড়া বাঁ-হাতখানা নিজের হাতে টেনে নেয়। তুজনেই চুপ করে থাকে। ছোট কথার বোঝাপড়াটা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের অনেক-কিছুর দাম যেমন একদিকে কমে তেমনি বেড়ে যায় অন্যদিকে। গভীর অন্তরবাসী এক সত্য ছাড়া অন্য কিছু যেন চোখে পড়ে না। লঘুভাবে বাঁচতে যেন ইচ্ছে করছে না আজ। জীবনের এই বিশাল ও মহান পরিচয় জানবার জন্যে যেন আজকের এই মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। সশ্রদ্ধ মনে বসে রইলো ওরা তুজন। সব চুপচাপ। শরতের শিশির ঝরছে। সে-শব্দও যেন শোনা যায় কান পাতলে।

॥ ৫ ॥

শান্তাহারের অধ্যায়টা নানা কারণে জুবিলী সার্কাস মনে রাখবে। কেননা সার্কাসটাকে ঢেলে সাজাতে তৎপর হলো গোপীনাথ। কতদূরে ছড়িয়ে জাল ফেলেছিলো সে কে জানে। জাল গুটোতে অনেক নতুন মুখ দেখা গেল। কেষ্টবাবু নানা কাজের কাজী। তিন দিন ডুব মেরে থেকে চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ফিরলো। ছয় থেকে দশ অবধি তাদের বয়স। শ্যাম, পটল দুটো, ছেলে। আর শিউলী, জুলি দুই মেয়ে। ভারী হলো গোপীনাথের রিজার্ভ দল। এরা এক কথায় বে-ওয়ারিশ ছেলেমেয়ে। মা বাপ এদের স্বীকার করেনি, অথবা রোজগারের জন্যে ঠেলে দিয়েছে পথে। নইলে সার্কাসে কে দেয় ছেলেমেয়ে ? গোপীমাস্টারের দলের খাওয়া-পরা, ব্যবহার-বন্দোবস্তের সুনাম আছে সার্কাস-দুনিয়াতে। তাই এখানে আসতে এদের আপত্তি হলো না। সকলেই যে উৎরোবে তা নয়। তবে একটা-দুটো আর্টিস্ট তৈরী হলেই শ্রম সার্থক। কত কথাই তো চালু আছে সার্কাস সম্পর্কে। ছোট ছেলেমেয়েদের যে শ্রম করে শিখতে হয় খেলা, দেখলে সাধারণ মানুষ শিউরে উঠবে। খেলা শেখবার সময়ে ভুলচুক হলে চাবুক চলবে। উপোসী রেখে দেবে পুরোদিন। কিন্তু কঠোর না হলেও চলে না।

মাস্টার বলে,—শিখবার সময়ে ক্ষমা করলে শত্রুর কাজ করা হবে। এতটুকু এদিক ওদিক হ'লে রগ ছিঁড়ে জখম হয়ে হয় মরবে, নয় খুঁতো হয়ে থাকবে জন্মভোর, তখন ?

অন্যান্য পেশার সঙ্গে সার্কাসের তুলনা হয় না। সার্কাসের মানুষের একটি খেলা শিখতে পনেরো বছর লাগে। অথচ খেলাটি দেখায় সে বড়জোর সাত-আট বছর। যৌবনের সময়টি। যৌবনও গেল, খেলাও ফুরোল। শরীর আর তেমন অনায়াসে নমনীয় রইলো না। শিথিল হতে সুরু করলো মাংসপেশী। বয়স হলেই যে আর্টিস্ট বসে

যাবে তা নয়। তবে পড়তে সুরু করবে। আর উঠবে না খেলা। তখন বড় সার্কাস ছেড়ে মাঝারী সার্কাস ; তার থেকে রাস্তার ধারে তাঁবু খাটিয়ে খেলা ; তার পরে চড়ক-রাসে মেলার মরসুম খুঁজে-খুঁজে ছেঁড়া কাপড়ের পাল খাটিয়ে দুই-আনার টিকিটে খেলা দেখানো ; এই তাদের পরিণতি। তারপর বে-ওয়ারিশ মানুষ হয়ে পথে ঘাটে মরা। এ-ই হলো নিরানব্বুই জনের কপাল। সার্কাসের মানুষের অনেক সমস্যা। তারা আর ঘরদোরের কাজ করতে পারে না। ছকবাঁধা জীবন ভালো লাগেনা। ইট-পাথরের ঘরদোরে হাঁপিয়ে ওঠে। যৌবনের সময়টুকু কাজে রেখে তার পরে ঝট্ করে বাতিল করে দিলো বলে সার্কাসের মানুষ ক্ষোভ করে না। কেন না যারা দর্শক তারা শুধু অল্পবয়সের আর্টিস্ট চায়। তাজা তাজা মুখ দেখতে চায়।

সার্কাস হলো যৌবনের খেলা। মিথ্যে ক্ষোভ করে লাভই বা কি ! তাই সে দিক থেকে বোধহয় সার্কাসের আর্টিস্টের জুড়ি নেই। ইনশিওর হয় না তাদের। ভবিষ্যতের কোন ভরসা নেই। তবু সার্কাসের আর্টিস্ট হেসে হেসে মানুষকে আনন্দ দেয়। একই সার্কাস পার্টি ঘুরে ঘুরে আসে। শুধু অলক্ষ্যে, খেলা পড়ে গেছে এই যুক্তিতে একটা দুটো আর্টিস্ট ফি বছর পালটায়। যারা দেখে তারা কি সে সব কথা বোঝে ? তারা কি মানুষগুলোর ভয়ভরসা হতাশা-র এতটুকু আঁচ পায় ?

পায় না। সেখানেই সার্কাস আর্টিস্টের কৃতিত্ব। অনেক কথা চাপা থাকে তাদের রঙীন টিউনিক আর আলগা নাকের নিচে।

সব কথা চেপে রেখে মৃত্যুর সঙ্গে তুড়ি বাজিয়ে টেক্কা দিয়ে বাঁচে সার্কাসের মানুষ।

রিজার্ভ দল বাড়িয়ে মাস্টার দলটি বাঁধলো। ওদিকে নতুন খেলা কিনলো রতিলালের কাছ থেকে। খেলা যে নতুন তা নয়। তবে এ সার্কাসে এই প্রথম। মামুলী খেলা বলে এতদিন ঝোঁক করেনি মাস্টার। তিন ছোরার খেলা। লাঠির মাথায় বলবেয়ারিং। তার

সঙ্গে বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে তিনটে ছোরা। এক ধাক্কায় লাঠিটা ঠেলে দিয়ে শুয়ে পড়বে মানুষ। ছোরা তিনটে এসে দুই দিকের কাঁধ আর মাথা ঘেঁষে পড়বে মাটিতে গেঁথে। নিশ্চিত মৃত্যু নিয়ে খেলা। এবার রতিলালকে নিজেই খবর করে আনালো গোপীনাথ। রতি-লালের বাপ উৎসব, আর দাদা গোপাল, দুজনেই মরেছে এই খেলায়। তার মেজদাদার ডান চোখটা শেষ হয়ে গিয়ছে। ভয় ছিলো রতি-লালের। তাই পালিয়ে গিয়েছিলো অন্য ছোট দলে। বোতল নাচাতো, রুমালের ম্যাজিক করতো। তার ওপর টাঁক ছিলো মাস্টারের। কথাবার্তা কয়ে এরিনাতে এলো রতিলাল। বালি বিছিয়ে সুরু করলো প্র্যাক্‌টিস কাঠের ছোরা নিয়ে। কুড়িয়ে দিতে গিয়ে হারাণ বললো,

—রতিদা, এসে পড়লে শেষ অবধি ?

—চুপ যা হারাণ।

ঠোঁট টিপে মুখ সিঁটকে প্র্যাক্‌টিস করে রতিলাল। আসলে তাকে পেয়ে বসেছে মৃত্যুভয়। বাপ-দাদার কথা সে ভুলতে পারেনি কোন দিন। প্র্যাক্‌টিসের ছোরা কাঠের। তবু কাঠের ছোরাই রতিলালের চোখে ধারালো ইস্পাতের মতো ঝল্‌কাচ্ছে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে গোপীনাথ কেষ্টবাবুকে বললো,—রতিলালের কল্‌জে-টা ভয়ে কমজোরী হয়ে গিয়েছে রে! ওকে দুধ বন্দোবস্ত করে দিস বিকেল থেকে।

—হ্যাঃ—বলে তাচ্ছিল্য জানালো কেষ্টবাবু। বললো,—ও চিরকাল ঐরকম। এত ভয়, তো এল কেন ?

হাসতে লাগলো গোপীনাথ। বললো,—সেধে এসেছে, তাই না রে কেষ্ট ? সাধুরামের দল থেকে মেয়ে ভাগিয়ে বিয়ে করেছিলো। দুটো বাচ্ছা হয়েছে। তাদের রেখেছে মালদ' ইংলিশ বাজারে। পেট চলে না। টাকার বড্ড দরকার। আমিও তাকে ছিলাম। কব্‌জা কারছি।

—ভীতু মানুষকে নামালি গোপী? ভালো করলি না। যদি এমন তেমন হয়?

—এক মাসের মধ্যে নামাব না। দেখিস তদ্দিনে ভয় ভাঙ্গবে। আর ওকে দিয়ে আমি ড্যাগার থ্রো করাব। শিউলী মেয়েটা ডাঁটো আছে।

—ধুস্! পচা খেলা। বোর্ডে মেয়ে দাঁড়ালো আর চোখ বেঁধে ছোরা ছুঁড়লো। এ খেলা তো হরদম দেখে মানুষ।

—তবু মোটা খেলা কটা রাখতে হয়। জানলি রে কেষ্ট? চাষা-ভূষোর ধানের টাকা যদি তুলতে চাও, তো মোটা নম্বর ক'টা চাই।

—তা বটে।

—মরণ-গ্লোবের জন্যে নতুন মানুষ দেখ্ তুই কেষ্ট। ও লালবাবু আর বেশীদিন নয়। যে মদ ধরেছে!

—ওতেই তো মরবে।

—সেবার আলবের্ট সাহেবের কি হলো মনে নেই?

—আলবের্ট-ই তো লালবাবুর গুরু কিনা! হাতে করে সব শিখিয়ে গিয়েছে। এত রোজগার করেছে এক সময় আলবের্ট, অথচ মরলো ছ্যাখোগে চ্যারিটি-ওয়ার্ডে।

—লালবাবুকেও ভূতে ধরেছে। সাইকেল হাতছাড়া করতে-না-করতে বোতল চাই। হাত কাঁপে, মুখচোখ ফুলেছে—এবার একদিন একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে না বসে!

শিস দিতে লাগলো কেষ্টবাবু। বললো,—কোহিনূর-কোম্পানির রবার্ট ছোকরাকে ডাকলেই আসে।

—বাঙালী ছেলে ছ্যাখ্?

—হবে খ'নি।

গোপীনাথের বাল্যে তার গুরু তাকে যা যা শিখিয়েছিলেন তার একটি অনুশাসনও সে মানতে পারেনি জীবনে। শুধু স্বদেশপ্রীতিটা সে ভোলেনি। তার গুরু গোষ্ঠমাস্টার আর অনন্তবাবু সকালে যোগাসন প্রাণায়াম শেষ করে কাঁচা দুধ খেতেন। তাঁদের যা

কথাবার্তা হতো সেই সময়ে। মাস্টার বলতেন,—সব জায়গা থেকে ধাক্কা খেতে আজ বাঙালীর এমন অবস্থা হয়েছে। বাঙালীও নিজের দেশের মানুষকে ঠাঁই দিতে চায় না। তাইতো এত লক্ষ্মীছাড়া হাল বাঙালীর!

অনন্তবাবুর রক্ত গরম। তাই তর্কের কথা তুলতো। বলতো,—দেশ মানে কি শুধু বাংলাদেশ?

গোষ্ঠমাস্টার অল্প অল্প হাসতেন। বলতেন,—আগে ঘরের মাকে ভালোবাসবি, নিজের পেটে যে ঠাঁই দিয়েছে তাকে ভালোবাসবি। তবে না বাইরের দিকে তাকাবি? তোদের শুধু কথার কায়দা!

সেই মানুষের মহৎ আদর্শবাদের কিছুটা অনুশাসন আজও গোপীর মনে কাজ করে। পাকানো-চেহারা বোতলের গোলাম লালবাবুর নামে লাল কালির ঢ্যারা পড়লো বটে, তবে আরো কোনো অজানা অচেনা বাঙালী ছেলের অন্নের দিশা হলো। আর একজনের ভাগ্য ফিরলো।

কেষ্টবাবু খলিফার তাঁবুতে চলতে চলতে ছাখে সুকুলবাবু, সাম্বো আর মাসী শুনছে। লালবাবু হারমোনিয়ম বাজাচ্ছে। তার মনে হলো এই মানুষটার সম্পর্কেই আলোচনা করছিলো সে গোপীর সঙ্গে। লালবাবু জানেও না যে তার দিন ফুরিয়ে এলো এই সার্কাসে। মনে হলো মানুষের কপাল নিয়ে খেলে গোপীনাথ। গোপীনাথ মহাশক্তিমান, যেন ভগবান!

—বেহাগ বাজাচ্ছি কেষ্টবাবু, শুনে যাও।—চেঁচিয়ে ডাকলো লালবাবু।

মাথা নাড়লো কেষ্টবাবু। বেহাগ বাজানো বেরিয়ে যাবে তোমার। এখন যত পারো বাজিয়ে নাও।

গোপীনাথের সার্কাসে ওদিকে বাঘের খেলা বড় জমে উঠলো।

ব্যাণ্ডমাস্টার সেই সময়ই বিলিতী বাজনা বাজায় ঝম্‌ঝমিয়ে। সকালে হ্যাণ্ডবিল বিলি হয় জোতদারের মোষের গাড়ী চড়ে। সন্ধ্যেবেলা ফসলের টাকা ট্যাঁকে নিয়ে সার্কাসের মুরুব্বিরা এসে পড়ে। বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে গরুর গাড়ী চড়ে চলে আসে। তাঁবুর সামনে গোলমিঞার জমিতে বটগাছের তলায় কাঠ জ্বেলে রান্না চড়ায়। আউসের চাষ দিতে ক'মাস যে কষ্ট গিয়েছে চাষীর! এখন হাত খুলে খরচ করতে বেশ লাগে। নিরাপদ, নিবারণ, উদ্ধব, ওফিলদ্দি, বসির সেখ-রা গঞ্জহাট জায়গার শুদ্ধ উচ্চারণ টেনে জোরে জোরে বলে, —জেলেপি, অসগোল্লা খায়্যা যা যতো পারিস। আজ কাল দু'দিনে চার টিপ খেলা গ্যাখ্। হ্যাঁঃ, খর্চো কত্তে পেছপাও হব না।

সারাদিন বাঘ দেখতে চেষ্টা করে তারা আর সারাদিনই তাড়া খায়। সন্ধ্যেবেলা আট আনার টিকিট কিনে দর্পভরে ঢুকে পড়ে। দরোয়ানকে বলে,—এখন আর হাঁকিয়ে দিতে পারবা না। টিকিট কাট্যা ঢুকছি, হ্যাঁ।

বাঘের খেলা শুরু হবার আগে আলগা নাক আর ঢোলা সালোয়ার পরে সুকুলবাবু বোতল নাচায় আর চ্যাঁচায়।

—বারো বছরের ছেলের ঘাড়ে আশী বছরের মাথা! কখনো সম্ভব হয়? সোনার পাথরবাটি! কখনো সম্ভব হয়? দেখে যান! দেখে যান!

সাম্বো-জাম্বো আবদালা মরজিনা সেজে নাচ-গান করতে করতে ঢোকে—'আয় বিবি তুই বেগম হবি খোয়াব দেখেছি!'…

তারপর ব্যাণ্ড কিরকম রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বাজনার শব্দ শুনেই দর্শকের বুক কেমন-কেমন করে। মেয়েপুরুষ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। মা গো, না জানি কি হবে! ড্রাম বাজে। কোনো বোকা স্ত্রীলোক ফুঁপিয়ে ওঠে।

—তখনই জানি গো, সর্বনাশা কাণ্ড হবে! আমার যে বুকে পাথর পিটতে লেগেছে, বল্ তার কি নির্ভরসা করি!

—চুপ যা, চুপ যা ! চারিপাশ থেকে প্রতিবাদ ওঠে।

গড়গড় করে সার সার খাঁচা ঢোকে। আগে আগে বাঘছাল-ছাপা ছোট জাঙিয়া পরে ঢোকে মনোহর। তার হাত ধ'রে জরির আঁটো জামা পরে আসে প্রেমতারা। সকলকে ঘুরে ঘুরে অভিবাদন করে। সঙ্গে সঙ্গে ঢোকে জঙ্গী—বুড়ো হাতী। হাতী পা মুড়ে বসে। শঙ্করের খাঁচার দরজা খুলে যায়। প্রেমতারা হাঁকে,—শঙ্কর। আপ্, আপ্ ! লাফিয়ে হাতীর পিঠে ওঠে শঙ্কর। মনোহর টুল ধরে। তাতে পা দিয়ে শঙ্করের পিঠে ওঠে প্রেমতারা। হাতী এরিনা ঘোরে। তারপর মনোহরের হাত ধ'রে সুন্দর ভঙ্গীতে নেমে পড়ে প্রেমতারা।

দুই সিংহী এক সিংহ মিলে পিরামিড করে। পিঠে ওঠে প্রেমতারা। রুমাল উড়িয়ে হাসে। নামতে-না নামতে শঙ্কর আবার ওঠে প্রেমতারার ঘাড়ে। ধমক দিতেই পায়ে মুখ ঘষে শুয়ে পড়ে।

তারপরে বড় খাঁচাটার দরজা খুলে যায়। রাজকীয় ভঙ্গীতে নামে বাদশা। এদিকে ওদিকে চেয়ে গর্জন করে। গমগম করে ওঠে তাঁবুটা। ব্যাণ্ডের শব্দ চাপা পড়ে যায়। বাঘের খেলার সময়ে মনোহরের হাতে এরিনা। তার নির্দেশে বাঘ হার্ডল পেরিয়ে লাফায়। চেয়ারে বসে, ছাগলকে পিঠে নেয়। প্রেমতারার পিঠে দাঁড়ায়। এ সব মামুলী নম্বর। তার পরে আসে আগুনের রিং। একটার পর একটা আগুনের রিং লাফায় বাদশা। রুদ্ধশ্বাস জনতা নিশ্বাস ফেলে। ব্যাণ্ড বাজে নতুন সুরে। আনন্দে বাদশা ডেকে ডেকে ওঠে আর এরিনা ঘুরে আসে মনোহরের সঙ্গে। তারপর সবচেয়ে রোমহর্ষক খেলা। বাঘের মুখে মাথা দেয় প্রেমতারা। বেণীবাঁধা ছোট্ট সুন্দর মাথাটি বাদশার মুখে যখন ঢুকতে থাকে, তাঁবু থেকে এতটুকু শব্দ শোনা যায় না। মনোহরের বুক কাঁপে, গলার তালু শুকিয়ে ওঠে—যদি কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটে ? এক সেকেণ্ডও নয়। আবার মাথাটা বের করে আনে প্রেমতারা। এরিনাটা

ঘিরে প্রজাপতির মতোই হালকা নৃত্যছন্দে অভিবাদন করে। মানুষ হাততালি দেয়।

•

সুসময় পড়েছে গোপীনাথের সার্কাসের। তাই টাকা এলো বানের মুখে জলের মতো। শনি-রবিতে ছুটো করে শো হলো। ভালুক, উট আর ঘোড়ার মামুলী নম্বরকে কানা করে দিলো মনোহরের বাঘ-সিংহের খেলা। এবার অনেক কিছুই ঘটলো যা জুবিলী সার্কাসের মানুষ আগে কখনো দেখেনি। বোনাস দেবার নিয়ম নেই। তবু গোপীনাথ সকলকে এক মাসের মাইনে উপরি দিলো। লালবাবুর চাকরি যে-কোন দিন চলে যাবে। তবু লাল-বাবুকেও বঞ্চিত করলো না। ছুটির জন্য দরবার করে করে এক সময় হয়রান হয়েছে বুড়ো সুকুলবাবু। কি মনে করে তাকেও ছুটি দিলো গোপীনাথ। একসঙ্গে ছুই মাসের ছুটি। অবাক হয়ে চেয়ে রইলো সুকুলবাবু। বললো, মাস্টার, ছাড়িয়ে দিচ্ছ না তো?

—না না।

অনেকদিন হেসে অভ্যেস নেই। তাই হাসবার চেষ্টা করতে গিয়ে সুকুলবাবুর মুখখানা এমন আশ্চর্য দেখালো বেঁকেচুরে যে, তাকাতে পারলো না গোপীনাথ। সাঁই-সাঁই গলায় কথা কইতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরুল কষ্টে। সুকুলবাবু বললো,—তাহ'লে আজই চলে যাই কি বলো? হাসপাতালে দেখিয়ে ওষুধপত্র খাই, ক'টা দিন শুয়ে বসে থাকি, ভালো হয়ে যাব খ'ন।

সব বেঁধেছেঁদে নিয়ে মনোহর সঙ্গে স্টেশনে গেল। নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেস-এর থার্ড ক্লাসে সতরঞ্চি পেতে বসলো সুকুলবাবু।

—ঘরে যদি তিষ্ঠুতে দেয়, তো রইব। নয়, ধরে করে হাসপাতালে যাব, কি বলিস মনোহর?

—যা ভালো হয় করবে সুকুলদা। ফিরে এসো তাড়াতাড়ি।

—নিশ্চয়। আসবার সময় গোলমালে কইতে পারল না মাস্টার,

কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, না এলে পরে অসুবিধেয় পড়ে যাবে গোপী। সব নম্বরগুলোতেই ঠেকা দিতে হয় তো? তোরা কি বুঝবি, কত দায়িত্ব আমার?

নিজেই নিজের ওপর মূল্য আরোপ করে মনোহরের কাছ থেকে ভরসা চায় সুকুলবাবু। গোপীর যদি তাকে দরকার না থাকে, তো সুকুলবাবুর জীবনের মানেটাই এক নিমিষে ফুরিয়ে যাবে। আবার বললো,—সার্কাস ছেড়ে থাকতে ভালো লাগে না রে, মনোহর! রোজগার করি, তাতেই বলে ঘরের মানুষের মন পাওয়া যায় না।

—রোজগার বন্ধ হলে মোটে পুঁছবে না বলো? বসে গেলে তো ভারী মুশকিল তোমার সুকুলদা?

—বসবো কেন?—খ্যাঁক করে উঠলো সুকুলবাবু। বললো,—এত বড় কথাটা তুই বললি মনোহর?

নিজের মনের নিরন্তর আতঙ্কের কথাটা বলে ফেলেছে মনোহর। তাই সুকুলবাবুর চোখে ভয়। মনোহর অনেকদূর বোঝে। মমতায় বলে,—মুখ্যু গোঁয়ার, কি বলতে কি বলিছি, কিছু মনে নিও না সুকুলদা। ফুর্তি মনে চলে যাও। সেরে সুরে ঝাঁ করে চলে এসো।

ট্রেন চলতে শুরু করে। মনোহর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। বলে,—তুমি চলে এলে বোতলের নম্বরটা শিখবো, সুকুলদা।

সুকুলবাবুর কথা বোঝা যায় না। দুই রঙা আলো মনোহরের মুখে ঝল্‌কে গার্ড সায়েবের গাড়ীটা চলে যায় দূরে।

বড় তাঁবুর বাইরের দড়িদড়ার জটা ধরে দাঁড়িয়ে গল্প করে প্রেমতারা। রাত না হলে সময় হয় না তার।

মনোহর বলে,—রোজ যেমন বাদশার মুখে তুমি মাথা দাও, আমার কেমন যেন ভয় করে, প্রেমতারা।

—আমার ভয় করে না।

—কেন?

তুমি রয়েছ না ?

প্রেমতারার কোঁকড়া চুলের ওপর আস্তে আঙুল বোলায় মনোহর। গা যেন শিরশির করে। এই শরতের শিশির লাগলে যেমন হিম-হিম কাঁপুনি, তেমন নয়। কেমন যেন রক্ত চনমন করে। বলে,—এমনি ধারা লুকোচুরি করে আমার ভাল লাগে না, প্রেমতারা।

—তবে ?

সাদা দাঁত একটু ঝিলিক দেয়। নিঃশব্দে হাসছে প্রেমতারা। মনোহর একটু নিচু হয়। বলে,—দাঁড়াও না, এমনি তো আর চিরকাল রইব না। ব্যবস্থা করবোই।

—কি ব্যবস্থা ?

আরো হাসছে প্রেমতারা। মনোহর বলে,—কেষ্টবাবুকে বলে ফ্যামিলি-তাঁবু নোব। বিয়ে বসবো আমরা।

—দূর !

ঠাট্টা করে বলে মনোহর। প্রেমতারাও ঠাট্টা করেই জবাব দিতে চায়। কিন্তু গলাটা তার কেমন কেঁপে যায়। মনোহরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। দড়িদড়ার ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যেতে চায় প্রেমতারা। এক-মুহূর্তে তার পথ আটকে দাঁড়ায় মনোহর। বলে,—কেন, বিমল পারে আর আমি পারি না ?

যাবার পথ নেই। দুজনে দুজনের খুবই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। সাবান-ঘষা রুক্ষচুল উড়ে মনোহরের মুখে পড়ছে। শরতের হিমেও ঘামছে মনোহর। মনোহরের এত কাছে দাঁড়িয়ে খুবই অসহায় বোধ করছে প্রেমতারা।

—প্রেমতারা !

এত কাছে দাঁড়িয়েও নিজেকে শাসন করলো প্রেমতারা। মুখ তুলে বললো,—মনোহর, লুকোচুরি কে করতে চায় ? তবে এখন যদি নিজ-খেয়ালে করে বসো কিছু, তাতে করে মাস্টার কিন্তু সইবে না।

—কি করবে মাস্টার ?

ছেলেমানুষের মতো সাহস মনোহরের গলায়। প্রেমতারা বলে,—যেদিন কিছু করবো, সেদিন আর কারুকে ভয় করবোনা। জানিয়ে শুনিয়ে। ধর্মমতো। আজ-ই কি দিন বয়ে যাচ্ছে তোমার ?

অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের কথা শুনিয়ে দিয়ে পা ফেলে চলে প্রেমতারা। বলে,—তুমি এমন কথা বলো যে, ভয়ে আমার যেন দিশা টলে যায়, মনোহর।

—ভয়! কেন, ভরসা পাওনা ?

দড়ির জাল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় প্রেমতারা। চোখ টান-টান করে দেখে। দুর্বোধ্য রহস্যে চিকচিক করে চোখ। ঠোঁটের হাসি যেন খাপে-ঢাকা ছুরির রুপোলী আভাসটুকু। বলে,—আমার ভরসার মানুষ হতে সাধ হয়েছে ? খুব যে!

—কেন বুকে পাটা নেই ?

—আছে ?

আন্তরিক আবেগের মুখে মনোহর স্থান কাল ভুলে যায়। প্রেমতারার কাঁধে হাত রেখে বলে,—তোর মুখ দেখলে আমি বুকে অনেক ভরসা পাই, কোনো ভয় থাকেনা প্রেমতারা, তুই বিশ্বাস যা! আমার বুকখানা, বল্-তো চিরে ফেঁড়ে দেখাই। যেদিন থেকে তোকে চোক্ষে দেখিছি!

পুরুষের একই রূপ দেখেছে প্রেমতারা। তারা মনের কারবারেও চূড়ান্ত হিসেবী। দিতে চায়না। খালি নিতে জানে। এতদিনে অন্য কথা শোনে প্রেমতারা। এই কথাই পুরুষের মুখে শুনতে চেয়েছিল সে। আজ সেই কথাই শোনে। শুনে যেন বিশ্বাস হয়না। মনোহরের মুখে হাত চাপা দেয়। বলে,—চুপ, মনোহর! চুপ যা!

সে-হাত আর নামাতে দেয়না মনোহর। কাছে টেনে নিজের ঘামে ভেজা বুকের কাছে প্রেমতারার মুখখানা ধরে বলে,—করবো না চুপ! তোর শাসন আমি মানি না।

দুজনের গলাই নিচু। কথার চেয়ে বুকের ধড়াস্‌-ধড়াস্‌ শব্দ যেন শোনা যায় বেশী।

প্রেমতারা একটু একটু কাঁদে। নিজের চোখের জলের লোণা স্বাদ জিভে লাগলে আবার অবাক-ও হয়। ভাঙা গলায় ফিসফিস করে বলে,—আমায় ছেড়ে দে, মনোহর! তোর দুটি পায়ে ধরি। তোর পায়ের তলায় থাকবো, ছেড়ে দে!

—মাথায় করে রাখব।

—ছেড়ে দে!

তার দুই হাতের মধ্যে প্রেমতারা। এ কি কম আশ্চর্যের কথা! কেমন যেন ক্ষেপে ওঠে মনোহর। ভয় পায় প্রেমতারা। কান্নাভরা ভাঙাগলায় বলে,—কলঙ্ক দিয়ে তাড়িয়ে দেবে আমাকে—সকালে মুখ দেখাতে পারব না। তুই আমার এমন শত্তুর?

ছেড়ে দেয় মনোহর। নিজেকে সামলাতে একটু টলে যায় প্রেমতারা। আঁচল লুটোয় মাটিতে। খাঁচার ভেতরে থেকে যে-দুটো পিঙ্গল কপিশ চোখের ঘুমোবার কথা, তারা জ্বলে উঠলো হিংসেয়। মনোহর আর প্রেমতারার মন স্পর্শ করলো বাদশাকে। প্রেমতারার সান্নিধ্যটাকে হিংসে করে অস্থির বাদশা গর্জন করে উঠলো। চম্‌কে উঠলো প্রেমতারা।

আরণ্যকের সেই ডাকে ঘুম ভেঙে যায় তাঁবুর মানুষদের। বাদশা বার বার ডাকে। পেটটা টেনে নিয়ে আবার দম ছেড়ে দেয়। গর্জে-গর্জে ডাকে।

॥ ৬ ॥

এত বুঝেও ভুল হয়েছিল প্রেমতারার। গোপীনাথ যে চার চোখে দেখে আর সব কিছু বোঝে, সেটা যেন হিসেবে ছিলোনা।

গোপীকে সচেতন করতে মানুষের অভাবও ছিলোনা। পরিমল, ননী, বাঁশী, প্রসাদ এই সব ছেলেদের নিরন্তর লক্ষ্য কেমন করে মাস্টারকে খুশী করা যায়। আরো আছে মেয়েরা। মেয়েরা কথা কয় বেশী। হাসে বেশী। প্রেমতারার ওপর তাদের যে গোপন হিংসে নেই তা-ও নয়। তুটি বোন টিয়া চন্দনা সাদা-মাটা চেহারা। তবে শরীরটি পেটানো। ময়লা রঙ। শক্ত শক্ত হাত পা। এরা এসেছিলো মিশন থেকে। মা বুঝি সাঁওতাল। বাবার নাম ঠিকানা জানা নেই। মা যতদিন ছিলো, নার্সের কাজ করে খাইয়েছে। মিশনের মেম বুড়ী ভালবাসতেন মাকে। মা মরতে মেয়েদের কাজের যুগ্যি লেখাপড়া শেখালেন। কিন্তু শহরে দেখতে গেল এক মাদ্রাজী সার্কাস। দেখে শুনে টিয়া চন্দনা যখন মুগ্ধ, তখন সোলেমান সাহেব নামের এক ছোকরা দালালের পাল্লায় পড়ে পালালো তুই বোন। মাদ্রাজী সার্কাসের ম্যানেজার আমলই দিলোনা। তখন শেষ অবধি এক সি ক্লাস সার্কাস। ছেঁড়া কানাত, রোগা বাঘ, আধা বুড়ো বুড়ী আর্টিস্ট, খেঁকি ম্যানেজার। তিন বছর অকথ্য কষ্ট। তারপর এই সার্কাস।

সাত ঘাটের জলখাওয়া মেয়ে টিয়া চন্দনা প্রেমতারার রূপযৌবন পদমর্যাদাকে হিংসে করে। তাদের কানাকানিতে অনেক কথা পৌঁছয় গোপীর কানে। তুইবোন-ই বিয়ে করতে চায়। ঘরসংসার ছেলে মেয়ে চায়। মাতাল স্বামীর হাতে তু'ঘা মার খেয়ে আবার ভাব করে মাছের ঝাল রাঁধতে চায়। এতটুকু সাধ, তাই তাদের পোরে না। তাই টিয়া চন্দনা প্রেমতারার সুখ দেখে হিংসে করে। কি অবিচার ভগবানের? একজনকে এমন করে তু'হাত উপছে ঢেলে দেয় কেন?

দশ জনের কানাকানিতে হঠাৎ তৎপর হয় গোপীনাথ। সত্যিই তো খুশী করতে হলে প্রেমতারাকে এটা সেটা দিতে হয়। প্রেমতারা যে ঐ মনোহরকে ভালবাসে গোপী বোঝে সে নেহাতই গল্প কথা।

তার মনোযোগ না পেয়ে প্রেমতারা ঐ ছলনা করছে। ছল করে টানছে গোপীকে। এত জানে, তাই তো ভাল লাগে প্রেমতারাকে।

পয়লা হপ্তায় মাইনে হাতে দিয়ে গোপীনাথ প্রেমতারাকে বললো, —এতদিন মুখেই বলিছি, এবার একখানা শাড়ী তোমাকে আমি দেবো, প্রেমতারা।

আশ্চর্য হয়ে তাকালো প্রেমতারা। বললো,—সেকি মাস্টার।

এতকাল অবধি প্রেমতারার টাকাকড়ি গোপীনাথই রেখেছে। এবার প্রেমতারার কী খেয়াল হলো, চেয়ে নিলো সবগুলো মোড়ক। নতুন কাপড়ের খোলে সেলাইকরা পুলিন্দা। সেলায়ের মুখে গালা-মোহর করা। টাকাগুলো হাতে তুলে দিতে দিতে গোপীনাথ বললো, —কাছে টাকা রেখে মরবে, তারা, পোস্টাপিসের খাতা করলেই পার?

—আজ এখানে কাল সেখানে, লেখাপড়া জানিনা, আমাদের টাকা পোস্টাপিসে রাখা পোষায় না, মাস্টার।

—তবে?

—শশীদাদা আর মাসীকে আমরা টাকার ভার দিয়েছি, মাস্টার। সে-ঘরে চুরি হবেনা।

—চুরি হবেনা?

—না মাস্টার, না।

বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে গেল প্রেমতারা। ফরসা মুখ লাল করে হাসতে হাসতে বললো,—মনোহর গুনতে জানে। চুরি হলে পরে ফাঁদ পেতে চোর ধরে দেবে।

প্রেমতারার ভরা-যৌবনের লাস্য গোপীনাথের মনে ছিলো। তাই বিকেলে বাজারে ঘুরতে গেল পকেটে টাকা নিয়ে। কাপড় দেখতে দেখতে মনে হলো 'সিনারি পাড়' শাড়ীর কথা মেয়েদের মুখে শুনেছে। যারা সার্কাস দেখতে আসে তাদের পোশাক মন দিয়ে ছাখে সার্কাসের মেয়েরা। থার্ড ক্লাস গাড়ীর কামরায় গাদাগাদি হয়ে বসে এ-জায়গা থেকে ও-জায়গা যাবার সময়ে মেয়েরা এসব

গল্প করে। প্রেমতারা এই শান্তাহারে আসবার সময়েই বলছিলো—
—দেখিস্‌নি চামেলী-দিদি? কেমন সিনারি-পাড়ের কাপড় উঠেছে?

—দেখিনি আবার?

—কেমন গাঙ দে' নৌকো ভেসে যাচ্ছে, কেমন চাঁদ উঠেছে, কেমন তালগাছের সারি! দেখিস্‌নি?

—দেখিছি।

—আমি একখানা কিনবো। এবারে মাইনের টাকা নে' বাজারে যাব।

চামেলী বলেছিলো,—বাজারের মানুষের মুণ্ডু ঘোরাতে যাবে? তোমার শুধু কু-বুদ্ধি। তোমাকে যেতে হবে না। ও এনে দেবেখ'ন।

—আমি পারব না—শশী ডেকে বলেছিলো।

তখন হাসতে-হাসতেই আবার গলাটায় কেমন মন-কেমন-করা সুর লেগেছিলো প্রেমতারার। বলেছিলো,—বিকেলবেলা গা ধুয়ে একখানা সিনারি-পাড়ের কাপড় ঘুরিয়ে পরে ঘরে বসে থাকা—বেশ লাগে না গো চামেলী দিদি?

—ঘরে বসে থাকতে?

—আমার বড্ড ভালো লাগে। কেমন, কিছু করব না—যখন খুশী উঠবো—যা খুশী করবো—বসতে ইচ্ছা গেল তো বসেই থাকবো…

বলতে বলতে প্রেমতারার মুখখানা কেমন ছেলেমানুষ দেখিয়েছিল। সেই মুখের দিকে চেয়ে শশী বলেছিলো—আমি একখানা বাড়ী তুলবো। সেই বাড়ীতে তুই বসে থাকিস। আহ্লাদ করে কেমন?—হেসেছিল প্রেমতারা।

প্রেমতারার সেই সময়কার মন-কেমন-করা মুখখানা আর টাকা হাতে নিয়ে প্রেমতারার লাস্য করে হাসা—দুটোই মনে ছিলো গোপীনাথের। তাই সবুজ রঙের লাল পাড়ে সিনারি ছাপা একখানা হাওয়াই শাড়ী, যমুনা সাবান, একশিশি অগুরু কিনে ফেললো গোপীনাথ।

কেষ্টবাবু বললো—তুই দিবি প্রেমতারাকে? লোকে কি বলবে গোপী?

—কি বলবে?

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে গোপী বললো,—তুই যেন সার্কাসে নতুন এলি কেষ্ট? হঠাৎ লোকের কথা তুলছিস্?

গোপীনাথ তাই লুকিয়ে চুরিয়ে নয়, ডেকেই দিলো প্রেমতারার হাতে তার উপহার। হাতে নিয়ে প্রেমতারা যেন কেমন হয়ে গেল। বললো,—আমাকে দিচ্ছ?

—নয়তো কি ঐ দুই ছেলের মা শশীর বৌকে দিচ্ছি? ন্যাকা সেজো না, প্রেমতারা।

এ উপহার হাতে নিতে লজ্জা, আবার না নিলে মাস্টার চটবে। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা গোপীনাথ, তাকে চটাবার সাধ্য কি প্রেমতারার? সার্কাসের যে মেয়েকে যখন চোখে লাগে, তাকেই এমনি করে হাতে আনে গোপীনাথ। প্রথমবেলায় স্নো পাউডারের শিশি, তারপর শেষ অবধি সে-মেয়ের ডাক পড়বেই গোপীনাথের তাঁবুতে। সেই অনেক রাতে ত্রস্ত চলাফেরা, এ-তাঁবু থেকে ও-তাঁবুতে চলে গেল একখানা ছায়া সাঁৎ করে, এই দেখেই সার্কাসের মানুষ জানতে পারে কি হলো না-হলো। তবে কিনা এসব বিষয়ে কথা কইতে নেই। প্রেমতারাও জানতো যে, গোপী তাকে হয়তো ছেড়ে কথা কইবে না। এই যে কথাবার্তা হাসিঠাট্টায় দিন কেটে যাচ্ছে, এই যে প্রেমতারার সব কথাই মেনে নিচ্ছে গোপীনাথ—এই সবের ভেতর দিয়েই তো সেই সত্যটা বেড়ে উঠেছে। গোপীনাথ কারুকে অম্‌নি কিছু দেয় না। দাম নেয়। কাপড় আর অগুরুর শিশি হাতে নিয়ে সার্কাসের মেয়ে প্রেমতারা গালে হাত দিয়ে বসে রইলো। তার তো আর জানতে বাকি নেই। সার্কাসের মেয়েরা দাম এক ভাবেই দেয়। আজকে যে গোপীনাথ খোলাখুলি তাকে ডেকে হাতে করে উপহার দিলো, তারপরে কি হবে? এখানেই তো থামতে চাইবে না

গোপীনাথ। কি করবে প্রেমতারা? সার্কাসের মানুষ হয়তো আশ্চর্য হবে না। তারা বলবে এ তো জানাই ছিলো। বলবে—প্রেমতারা, এ তোমার ভালোই হলো। বুদ্ধি যদি থাকে তো, গুছিয়ে নাও এখন। মালিককে বশ করো। এমন করে বাঘ-সিংহকে খেলাও প্রেমতারা, একটা মানুষকে বশ করতে পারবে না? আর সার্কাসের মালিক যদি তোমার হাতধরা হয় প্রেমতারা, তবে তোমার বাকি জীবনটার তো কোনো ভাবনাই রইল না। যৌবন গেলে, শরীরে মৃত্যুভয় ঢুকলে, যখন খেলা দেখবার নামে শিউরে উঠবে,—ট্রাপিজে দুলতে দুলতে পা কাঁপবে, অনেক উঁচু থেকে মানুষের মুখগুলো দেখতে দেখতে ভয়ে দুরদুর করবে—সার্কাস-আর্টিস্টের সেই চরম দুর্দিনেও তুমি নির্ভয়ে থাকতে পারবে। ক্যাশবাক্স নিয়ে বসবে জুয়েলের মতো। নিজে যে একদিন সার্কাসের মেয়ে ছিলে,—ট্রেনারের চাবুক পিঠে, আর কামনার স্বাক্ষর ঠোঁটে গালে নিয়ে অনেক রাত যে তোমার কেঁদে কাটতো, সে কথা ভুলে গিয়ে তুমি-ই অন্য মেয়েদের ওপর হামলা করবে। নোয়ান আর পীকক-এ ভুল হলে নিষ্ঠুর বিদ্রূপে বলবে—চলে যাও যেখানে খুশী, সার্কাস তোমাকে চায় না। তখন তোমার এ কথা মনে পড়বে না প্রেমতারা, যে সার্কাসের মেয়েদের যাবার জায়গা কত কম। সেদিন তুমিই অন্য দিকে কুশ্রী হবে। গোপীনাথকে আগলে রাখবে অন্য উঠ্‌তি বয়সের মেয়েদের সংস্পর্শ থেকে। কুৎসিত সন্দেহ করবে সকলকে।

সার্কাসের মানুষ তোমাকে এমনি করে কথা কইবে, প্রেমতারা।

প্রেমতারা তা জানে। এক বছর আগে হলে প্রেমতারা দ্বিধা করতো না। সার্কাসের মেয়েদের জীবনটা এত কষ্টের, তাদের জীবনে পড়তি বছরগুলো এমন ভয়াবহ যে, কোনো কথা না ভেবে প্রেমতারা রাজী হতো। বলতো,—আমাকে বিয়ে করো, মাস্টার। আমার নামে পাস-বইয়ে টাকা লিখে দাও। তবে আমায় পাবে।

প্রেমতারা জানে সে-ও অসম্ভব হতো না।

কিন্তু আজ কেন প্রেমতারা সে কথা ভাবতে পর্যন্ত পারলোনা ? কেন সোনা ছেড়ে আঁচলে গেরো দেবার জন্যে প্রেমতারার ভরা-যৌবনের মন আকুলি-বিকুলি করছে ? কার ভরসায় প্রেমতারা এমন ভরসা পেয়েছে যে, সব কিছুই মনে হচ্ছে তুচ্ছ ? সার্কাসের মেয়েকে হিসেব করে করে চলতে হয়। দুনিয়াকে বিশ্বাস করতে হয় না। টাকা-পয়সা গুনে-গেঁথে লুকিয়ে রাখতে হয়। সে-সব শিক্ষা ভুলে প্রেমতারা কেন বে-হিসেবী হতে চাইছে ? ফরসা গাল দু'খানা যে চোখের জলে ভিজে গেল, তাই বা হলো কেন ? প্রেমতারা কি এই সব ছাপিয়ে অন্য কোনো সুখের সন্ধান পেয়েছে ?

মনোহর বেহিসেবী, সরল, গোঁয়ার আর গরীব একটা মানুষ। সে-ই প্রেমতারার চোখদুটিতে প্রেমের কাজল পরিয়েছে। তাই প্রেমতারা আজ সব-কিছু অন্য রকম দেখছে। চোখ মুছে প্রেমতারা তাঁবুর দোরে দাঁড়ালো। শশীর তাঁবুতে বেপরোয়া শশী চড়া গলায় গান ধরেছে। চামেলী ওদিকে বকে চলেছে। মাসী বাইরে চৌকি পেতে বসে চামেলীর ছেলেমেয়েকে তেল মাখাচ্ছে। দেখে দেখে কেমন যে হলো বুকের মধ্যে ! প্রেমতারার মনে হলো, যত সুখ সব যেন চামেলী আর শশীদাদার তাঁবুতে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। আর যত দুঃখ সব যেন তার।

প্রেমতারার মন ভালো নেই, তা বলে তো আর মেলা বসে থাকবেনা। ক'দিন থেকেই চালাঘর বাঁধা চলছিলো। একটার পর একটা দোকানের সারি সেজে উঠলো। গোপীনাথের সার্কাসও জমে উঠলো। এই মেলার টাকা লুটে নিয়ে তবে শান্তাহার ছাড়বে গোপীনাথ। লাল নীল ইলেক্‌ট্রিকের বাতি এনে সার্কাসের বাইরেটা আলোর মালায় সাজালো কেষ্টবাবু। গোপীনাথেরও মেজাজ বড় খুলে গেল। একদিন এক'শো খেলা দেখিয়ে সার্কাসকে মেলায় ঘুরবার ছুটি দিলো। প্রেমতারাকে বললো—নতুন কাপড়খানা পরো, প্রেমতারা। মেলায় যেন দেখতে পাই। সাথে করে নে ঘুরবো অখন।

আজকে মেলায় মনোহরের সঙ্গে ঘুরবে বলে সাধ করে রয়েছে প্রেমতারা। মাস্টার কি বললো না বললো তাই নিয়ে ভাবতে বসবে? বয়ে গেছে তার। ঘাড়ের ওপর ফাঁপিয়ে মস্ত খোঁপা বাঁধলো প্রেমতারা। নতুন গড়ানো ছ'খানা রুপোর কাঁটা গুঁজলো। গলায় প্রেমফাঁস হার পরলো। কোমরে রুমাল গুঁজলো। আর, কি মনে করে গোপীনাথের দেওয়া কাপড়খানাই পরলো।

মেয়েদের ঝাঁক আজ ধরেছে গোপীকে। মাস্টারের মনে জানি কি আছে! মাস্টার নিজেই বলছে, আজ সে খাওয়াবে সকলকে। কালো সিল্কের কলার-দেওয়া গেঞ্জী পরেছে মাস্টার। দেখতে হয়েছে চমৎকার। হাতে ছোট্ট একটা ছড়ি নিয়েছে। মেয়েদের চুড়ি কিনে দিলো। বন্দুক ছুড়ে লটারি করছিলো একজন। সেখানে সকলকে টিকিট করে নিয়ে গেল। একটা টর্চলাইট পেলো চামেলী, আর আনন্দে কলরব করতে করতে মেয়েরা ঢুকলো খাবারের দোকানে। চা-এর কাপের ওপর কাপ সাজিয়ে নাচাতে সুরু করলো গোপীনাথ। দোকানের মালিক আপত্তি সুরু করলো আর হেসে গড়িয়ে গেলো মেয়েরা।

এই চা-এর দোকানে মেয়েদের বসিয়ে চামেলীর হাতে দশ টাকার নোট দিয়ে গোপী বললো,—দিয়ে দিস, চামেলী। আমি চললাম।

গোপী বেরিয়ে যেতে মেয়েরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। তারা বুঝলো যে প্রেমতারার খোঁজে বেরুলো গোপীনাথ। এদিকে প্রেমতারা যে কোথায় গিয়েছে তা তো জানে না মাস্টার। চামেলীর ভয় হলো। মনে হলো, প্রেমতারা সেজেগুজে মনোহরের সঙ্গে ঘুরছে, এ দেখলে হয়তো ক্ষমা করবে না মাস্টার। না জানি কি বিপদ হবে!

কোথায় গেল প্রেমতারা? ভীড়ের ফাঁকে ফাঁকে একখানা সবুজ শাড়ীর খোঁজ করছে গোপীনাথ। কার্বাইডের আলো ঘিরে শ্যামা-পোকা উড়ছে ঝাঁক বেঁধে। মানুষের পায়ে পায়ে ধুলো। হ্যাজ-

লণ্ঠন জ্বালিয়ে কাঠের ঘোড়ার ঘূর্ণিপাকে চড়াচ্ছে যেখানে, সেখানে মস্ত ভীড়। হঠাৎ কানে গেল খিলখিল হাসির লহরা। পাখির শিসের মতো চড়ায় উঠে কেঁপে কেঁপে ভেঙে পড়লো। হাসির শব্দ শুনে ঘাড় ফেরালো গোপীনাথ।

তীর ছুড়ে লটারি জিতেছে প্রেমতারা। সেই সবুজ শাড়ী পরেছে। নিচু হয়ে তীর ঠিক করছে আর তার ঘাড়ে দুই হাত রেখে ঝুঁকে দেখছে মনোহর। তীর লাগলো কি না লাগলো—দুজনেই হাসছে একসঙ্গে। প্রেমতারার মুখখানা যেন ঝলমল করছে। কানের দুলে মাথার চুলে জড়াজড়ি হয়ে গেল একবার। ছাড়িয়ে দিলে মনোহর। দুজনের মুখ কত কাছে! দেখে গোপীনাথ যেন জ্বলে গেল। লাঠির আগায় উঁচু করে বেলুনের পাঁজা উড়ছে। দেখে হাসতে হাসতে সেদিকে চললো প্রেমতারা। মনোহরের হাতে আবার একটা টিয়াপাখির খাঁচা। দেখে শুনে শিস ভেতরে টেনে পকেটে দুই হাত দিয়ে গোপীনাথ চলে গেল মেলার পেছন দিকে। সামনে নতুন গামছা পাঁজা দিয়ে যেখানে পেছনের দরজায় বোতল সাপ্লাই হচ্ছে। লালবাবু বসে রয়েছে বেঞ্চিতে। গোপীনাথ বসলো না। দুই পকেটে দুটো বোতল নিয়ে চললো সার্কাসে।

একটু বাদেই মনোহরকে ডেকে নিয়ে গেল শশী, বিমল আর কেষ্টবাবু। প্রেমতারা মুখ ভার করে এদিকে সেদিকে ঘুরলো কিছুক্ষণ। তারপর চামেলীর কাছে শুনলো শশীদের আজকের রাতে আর পাওয়া যাবে না।

—বিমল খাওয়াচ্ছে যে ওদের?

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁগো নেকী, বোতল নে গেছে। তুই জানতিস না?

—আমাকে বলেছে কেউ?

—নে লো, নে। আমাদের সঙ্গেই বেড়া এখন। তারপর কাল এখন ঝগড়া করিস্‌গে মনোহরের সঙ্গে।

—আমার মাথা ধরেছে। আমি চললাম।

—যা। আমরা এখন ফিরছি না। মাস্টার অবধি ওদের সঙ্গে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি ফিরবো কেন?

মাস্টার-ও নেই জেনে এক ভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁবুতে ফিরলো প্রেমতারা। মনোহরের ওপর রাগ হচ্ছিলো তার। সন্ধ্যেটাই নষ্ট। শশীদের সঙ্গে যেতে হবে, তা আগে বললোনা কেন? শশীও যেন কি! মনে নেই বিয়ের আগে প্রেমতারাকে পাহারা রেখে কত গল্প করেছে চামেলীর সঙ্গে? তাঁবুর হ্যারিকেন জ্বেলে আয়নার দিকে চাইল প্রেমতারা—আয়নাটা এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে এসে দাঁড়ালো গোপীনাথ।

—মাস্টার!

প্রেমতারার গলায় কথা আটকে গেল। মদ খেয়েছে মাস্টার। চওড়া কাঁধ ঘামে ভিজে উঠেছে। প্রেমতারার ঘাড়ে হাত রাখলো গোপীনাথ। বললো,—এমন সন্ধ্যেবেলা—একলা কেন প্রেমতারা?

হাত ধরে টেনে নিলো বাইরে মাস্টার। নিয়ে চললো নিজের তাঁবুর দিকে। হোঁচট খেতে খেতে, পড়তে পড়তে অসহায় প্রেমতারা একটা কথাও কইতে পারলো না। মেলা এখান থেকে আধ মাইল দূরে। আঁধারে তাঁবুগুলো সারি সারি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে।

গোপীনাথের খাটের ওপর বসে প্রেমতারা তবু কথা কইতে চেষ্টা করলো। বললো,—মাস্টার, শোনো,···আমার একটা কথা শোনো···

কোন কথা শুনবেনা গোপীনাথ। গোপানাথ কথা কইবে। তাকে মানায়, সে সাধ্য কি প্রেমতারার? প্রেমতারা বাধা দিতে চেয়ে হেরে গিয়ে কাঁদতে পারলো শুধু। বাঘ-সিংহ পোষ মানায় গোপীনাথ, গোপীনাথ বারবেল ওঠায়, গোপানাথ বুকে হাতী নেয়—সে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে উদ্দাম হয়ে ওঠে যদি, তবে কি করবে প্রেমতারা? প্রেমতারার চোখের জলের স্বাদও ভালো লাগলো গোপীনাথের; প্রমত্ত গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বললো,—জলে বাস

করে কুমীরকে কে বাদী করে, তারা ? আর, আমি তোমাকে ভালবাসি।

—না। মাস্টার····না···

অস্থির হয়ে বিস্রস্ত আঁচল গুছিয়ে প্রেমতারা উঠে দাঁড়াতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। গোপীনাথের ছু'খানা হাত লোহা হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। মুখের কথা ফুটতে পেলোনা প্রেমতারার।

নিঃশ্বাস নিতে দম নেই। বাইরে একটা সাড়া শব্দ নেই। সার্কাসে এমন ভূতুড়ে নিস্তব্ধতা সচরাচর হয় না। আজ কি কেউ নেই ?

গোপীনাথের ছুই হাতের পেষণে যন্ত্রণা হচ্ছে প্রেমতারার। জেনেও দয়া করেনা গোপী। ফিস ফিস করে বলে,—কষ্ট হচ্ছে ? হোক। অন্যকে এত কষ্ট দাও তারা, নিজে শুধু জলের পরে তেলের মতো আল্‌গা হয়ে রইবে, তা কি হয় ?—মাস্টার ছেড়ে দাও।

প্রেমতারার গলাতেই বা স্বর কোথায় ?

—ছুটি পায়ে পড়ি।

পায়ে কেন ? বুকেই ত' নিতে চায় গোপী। প্রেমতারা তা জানেনা ? ন্যাকা। বদমায়েস মেয়েমানুষ। প্রেমতারার বজ্জাতির গলা টিপে মারতে চায় গোপীনাথ। যাতে আর কোন বে-চাল না করে প্রেমতারা।

সব প্রতিরোধ মিথ্যে হয়ে যায় প্রেমতারার। আঁচলের দিশা নেই জামা ছিঁড়ে যায়। রুপোর কাঁটা ঘাড়ে বিঁধে রক্ত ফুটে ওঠে বুঝি। ধাক্কা লেগে হারিকেনটা পড়ে যায়।

অন্ধকারে গোপী প্রমত্ত নিঃশ্বাস আর প্রেমতারার অস্পট আর্তনাদ। তারপর সে টুকু শব্দও শোনা যায় না।

অনেক দিন ধরে প্রেমতারা জ্বালিয়েছে গোপীকে। অনেকদিন ধরে জ্বলেছে গোপী। এতদিনে যেন শান্ত হলো মত্ত মাতঙ্গ। টলতে টলতে, একান্ত প্রবৃত্তি পাগল কোন আরণ্যকের মতোই চলে গেল গোপী। আঁধারে এতটুকু পদস্খলন হলোনা।

আর তাঁবুর ঘাসের ওপর পড়ে রইলো প্রেমতারা। চোখের জল পড়তে লাগলো মাটিতে।

॥ ৭ ॥

এমন রাত না পোহালেই কি? তবু রাত পোহালো। রাতের বেলা পাছে মনোহর আসে, তাই প্রেমতারা তাঁবুর দরজার কাপড়ে তার সাইকেলটা এনে চাপা দিলো।

মনোহর একলা নয়, সকল ছেলেমেয়েদের নিয়ে দল বেঁধে এসেছিল রাত করে। ঠাট্টা তামাসা হাসি হল্লা, কোন ডাকেই সাড়া দিলোনা প্রেমতারা। চলে গেল ওরা।

প্রচলিত নীতিবোধের অনুশাসন নেই, তবু যেন প্রেমতারার দেহমন ক্লিষ্ট। এই রাতও পোহাবে আর আবার মাস্টারের মুখোমুখী হতে হবে? একবার ঘেন্নায় মনে হলো গলায় দড়ি দেয়। আবার মনে হলো ছি! তার মনোহর আছে, সে গলায় দড়ি দেবে কেন?

রাতের বেলা নেশার ঘোরে নয়, পর-দিন সাদা-চোখে গোপীনাথ ভেবে দেখলো ব্যাপারখানা। এমনধারা অনেকবার-ই হয়েছে। সার্কাসে যে-সব মেয়ে এসেছে তাদের অনেককেই আসতে হয়েছে গোপীর তাঁবুতে। স্ব-ইচ্ছেয় পাউডার মেখে চুড়ি বাজিয়ে হোক, বা অনিচ্ছেয় চোখের জল মুছে ফেলে পায়ে পা জড়িয়েই হোক। প্রেমতারা ঠিক সে-জাতের মেয়ে নয়।

কেষ্টবাবুকে ডেকে নিয়ে বন্ধুর মতো মনখানা খুলে ধরলো গোপী। দেখতে দিল ভেতরটা। নিজের প্রয়োজনে গোপী বর্বর। সেখানে সে আর কারু কথা ভাবে না পর্যন্ত। যেমন রূঢ়, তেমনি কর্কশ। সেই গোপী এমন একখানা ব্যাপারে তার পরামর্শ চাইছে দেখে অবাক হলো কেষ্টবাবু। প্রেমতারা কি মনে করলো তাই ভাবছে

গোপী ? এমনটি সে অন্য কোনো মেয়ের বেলা ভেবেছে নাকি ? কেষ্টবাবুর তো মনে পড়লো না। গোপী বললো—না কেষ্ট, অমনটা করা আমার উচিত হয়নি।

মিছেই সার্কাসের মানুষের বিয়েতে রুমালে পদ্য ছাপায় না কেষ্টবাবু। মিছেই কবিতা দিয়ে হ্যাণ্ডবিল লেখে না। সে কবি-মানুষ। অন্যের মনের কথা বোঝে। গোপীনাথের আচার-ব্যবহার দেখে সে বুঝলো। বলা উচিত হবে কি-না হবে দুইবার ভেবে নিয়ে বললো—তুই বোধ হয় প্রেমতারাকে ভালবেসেছিস্ গোপী।

অস্বস্তি হলেও ঘাড় নেড়ে দোষ স্বীকার করলো গোপী। বললো,—মেয়েটা মন্দ নয়। আমি ওকে বিয়ে করব, কেষ্ট।

—বিয়ে করবি ?

—হ্যাঁ তুই ওকে একবার মন যাচিয়ে দেখবি।

—কিন্তু···

—ঐ মনোহরের কথা তো ? ও কিছু নয় রে। মনোহরের আছেই বা কি। ওটা কি জানিস্ ? দু'টো মায়া-মমতার কথা শুনে গলে গিয়েছে মেয়েটা। আর আমি ওকে বে' করব, ও কোনদিন ভেবেছে কি ? শুনলেই রাজী হবে অখন।

কেষ্টবাবু কিন্তু গোপীর মতো অতো নিশ্চিন্ত হলো না। মনোহর আর প্রেমতারার সম্পর্কে সবাই জেনেছে। গোপী কি অন্ধ ? দেখেও দ্যাখে না ? না কি এ কথা যদি প্রেমতারা অস্বীকার করে, তখন গোপী নিজমূর্তি ধরবে ? রুক্ষ রূঢ় একটা জানোয়ার হয়ে উঠবে ? যেমন হয়েছিলো ননীবালার বেলায় ? সার্কাসের দর্জির বিধবা বৌ ননীবালার একটা মিনতিও শোনেনি গোপীনাথ। তখন সবে মরেছে জুয়েল। যেমন মদ খেতো গোপী, তেমনই হাণ্টার চালাতো। পরে টাকাকড়ি দিয়ে এই কেষ্টবাবু-ই ননীবালাকে ডোমজুড়ে ভায়ের বাড়িতে রেখে আসতে গিয়েছিলো।

গোপীর হয়ে প্রেমতারাকে বলবে কেষ্টবাবু ? প্রেমতারা কার মন

হরণ করেনি এই সার্কাসে? কিন্তু তার জন্যে কি প্রেমতারাকে কোনো চেষ্টা করতে হয়েছে? সে যে স্বভাবেই রাণী। তাকে দেখলে ভালো লাগে না কার? কটা চুল সাবানে ফুলিয়ে জরির ফিতে বেঁধে, হলুদ-রঙের হাওয়াই কাপড় পরে বয়সের রঙে প্রজাপতিটি হয়ে প্রেমতারা যখন ঘুরে বেড়ায়? কেষ্টবাবুরও তো ভালো লাগে। তাই বলে ঐ গোপীনাথের মতো ভালো লাগা? যেটি ভালো লাগলো সেটি-ই মুঠোর মধ্যে চাই। চামেলীর ছেলেমেয়ের মতো শিশু তো নয়। বালকের এ আবদার শোভা পায় বটে। কিন্তু গোপীনাথের মধ্যে তেমন কোনো প্রসাদগুণ নেই। জানে কেষ্টবাবু। জানে যে, আদিম অনেকগুলো বৃত্তির জটে বাঁধা গোপীনাথের জটিল মন। নিজের ইচ্ছের মুখে এতটুকু বাধা সইবে না তার। এমনিধারা ঘোলাজলের মানুষ না হ'লে পরে গোপীনাথের চোখে পড়তো বইকি! পষ্ট দেখতে পেত সে, যে প্রেমতারা এখন মনোহর ছাড়া আর কারুকে দেখবে না। দেখতে পেত যে, এতদিন ধরে বুকের মধ্যে যে মনটি ধরে রেখেছিলো প্রেমতারা, অনেক ঝড়-ঝাপটা বাঁচিয়ে, সেই মনটি আর প্রেমতারার বশে নেই। আর একজনের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে প্রেমতারা।

গোপীনাথের হয়ে অনেকদিন অনেক মানুষকে জোড়া-তালি দিয়েছে কেষ্টবাবু। মন্দকাজও করতে হয়েছে কখনো। আজ যেন আর তা পোষাল না। জোড়াতালি দিয়ে দিয়ে আর চললো না।

নেয়ে এসে তাঁবুর দড়িতে কাপড় মেলছিল প্রেমতারা। কেষ্ট-বাবুকে দেখে বললো,—এসো।

কটা চুলকে তেলে জলে বশ করে পিঠে ছড়ানো। টিয়া-পাখী-রঙের কাপড় গেরস্ত-ঢঙে প'রে আঁচলে চাবি বাঁধা। কপালে আলগা টিপ। দেখে যেন মমতা হলো কেষ্টবাবুর। বিড়ি ধরিয়ে বিনা ভূমিকায় বললো,—তুই মনোহরকে বিয়ে কর্ না কেন, তারা?

মাথা নিচু করে কাপড়ের পাড় টানতে সুরু করলো প্রেমতারা। বললো,—মাস্টার দেবেনা কো।

—কে বললে ?

—দেবেনা। আবার রেগে চ'টে ওকে দেবে বরখাস্ত করে। মেজাজ জানোনা ?

—এখন তোকে শক্ত হতে হবে। মেজাজের ভয় করলে চলবেনা।

—কেন কেষ্টদাদা ?

—গোপী তোকে বে' করতে চেয়েছে।

এ কথা এমনই তাজ্জব যে, হাঁ করে চেয়ে রইলো প্রেমতারা। গলা শুকিয়ে এলো। তারপর আকুল হয়ে কেষ্টর হাত দুখানা চেপে ধরলো, বললো—কি হবে গো কেষ্টদাদা ?

—মনোহরকে ডেকে কথা ক'।

—কি কইব ?

—জানি না।

ব'লে উঠে দাঁড়ালো কেষ্টবাবু। বললো,—বলবি যে' করবো বলে মা-কালীর নামে শপথ খেইছি। যা মনে হয় বুঝিয়ে বলবি।

ভাখো কাণ্ড! একা তাকে নিয়ে দু'দুটো পুরুষমানুষ ক্ষেপে উঠেছে। শুধু মুখের কথা নয়। বিয়ে করতে চায়। অন্য সময় হলে পরে ঘটনার নভেলিপনায় দেমাকী হতো প্রেমতারা। সে দেমাক দুপুরবেলার মেয়ে মজলিসে মানায় ভালো। দুই পুরুষ আর এক নারীর প্রেমের কথা যে বলে, আর যারা শোনে, সকলেরই মনে পড়ে রামপুরহাটে দু'আনার টিকিট কেটে চাটাইয়ে বসে দেখা সেই সিনেমার কথা। সেখানেও গল্পটা এমনিধারাই ছিল। নিজেকেও নায়িকা মনে করে প্রেমতারার না জানি কত গর্বই হতো। একহাতে চুলে বিলি কাটতো আর অন্য হাত গালে রেখে উদাস হয়ে বসে থাকতো প্রেমতারা।

কিন্তু এখন সে-সময় নয়। তাই জলচুড়ি বাজিয়ে মাসীর খোঁজে

গেল প্রেমতারা। যদি বোঝে কেউ তো মাসী-ই বুঝবে। এই গোটা সার্কাসে আর একটা মানুষও নেই, যে নাকি মাসীর মতো জীবনের হাজারটা গলিপথ জেনেছে। মাসী যে-যুগে সার্কাসে এসেছিলো, সেটা থিয়েটারে বিনোদিনীর যুগ। তখন অবশ্য মাসী ছিলো ছোট। ভরা সার্কাসের মানুষকে ধোঁকা দিয়ে পার্শী ম্যানেজারকে নিয়ে ক্যাশ ভেঙে পালিয়েছিলো মাসী। সে-দিনকালে গাউন প'রে জুড়ি চ'ড়ে কলকাতায় বেড়িয়েছিলো। আবার শশীর বাবার জন্যে সে-সব ছেড়ে দিয়ে সার্কাসে ফিরে এসে কষ্ট করতে তার বাধলোনা। আজকে প্রেমতারার আগেই মনে হলো মাসীর কথা।

মোটা শরীরটা কষ্টে ঢেকে বসে মাসী চামেলীর জামার ঝালর বসাচ্ছিলো আর গালাগালি দিচ্ছিলো কাকে।

—কার মাথা খাচ্ছ গো মাসী—ভরা দুপুরে?

—ঐ হতভাগা বুড়ো। তাঁকে টাকা দিইনি মদ খেতে তাই গোঁসা হয়েছেন। আমাকে ফাটক দেবেন, কারবার বন্ধ করে দেবেন গোপীকে ব'লে। ওরে আমার ব্যাটাছেলে রে!

রাগলে মাসী লালবাবুকে সম্মানার্থে 'আপনি' বলে। প্রেমতারা হাসলো। বললো,—তুমিই বা দিলেনা কেন? গচ্ছিত টাকা।

—তুমি আবার ধামা ধরতে এলে কেন?

—কার ধামা কে ধরে মাসী? আমার ব'লে যে বিপদ।

—তা রাধিকা হয়েছো, বিপদের ভয় করলে হবে কেন?

—মস্করা নয় গো—

ব'লে প্রেমতারা মাসীর হাঁটুতে হাত রাখলো।

শুনে মাসী তাচ্ছিল্যে শব্দ করলে মুখে। বললো,—তার সঙ্গে ঘর বস্‌গে যা! তোরা যেন কেমনধারা হইছিস আজকাল। এসব কথা নে'কেউ ভাবে?

—মাস্টার রাগ করবে গো।

—কে? গোপী? কিছু করবেনা।

—তুমি জানোনা মাসী।

—আমি যা জানি তা তোমার জানতে হবেনা কো। গোপীকে সেই গোষ্টমাস্টারের সার্কাস থেকে দেখছি লো তারা! ঐ গতর-ই অতখানি। কলজেটুকু কবুতরের। এক হাঁকারে ডরায়।

—তবু।

—তবু আবার কি! এখানে গোপী দল বেঁধেছে, কেউ কথা কইবার নেইকো। আর কইবার দরকার-ই বা কি! তা ব'লে গোপীনাথের ভয়ে কাঁপতে হবে, গোপী সে-মেক্‌দারের মানুষ নয়। তোরা মানুষ দেখিসনি তাই। আমরা গোষ্টমাস্টারকে দেখিছি, শ্যামা-কান্তকে দেখিছি, আমাদেরকে ধাঁধা লাগানো অমনি কথা নয়, তারা!

শো-এর পর মদ খেয়ে মেজাজ ক'রে বসেছিলো গোপীনাথ। প্রেমতারার কথা শুনে ফুঁসতে লাগলো। বললো,—তুমি এমন বেইমান, তারা?

অল্প অল্প যেন ফুলছে দেহটা। গোপীকে বড় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। মস্ত থাবা দিয়ে প্রেমতারার ঘাড় চেপে ধরে। গোপী বলে,—মালদ'র কথা মনে নেই? কি হয়েছিলো তারা? তাঁবুতে এসেছিলে এক ডাকেই?

কোণঠাসা ক'রে প্রেমতারাকে তাঁবুর খুঁটিতে চেপে ধরেছে গোপী, পালাবার পথ নেই। এখন সার্কাসের মেয়ের রক্ত ক্ষেপ্‌তে থাকে। নীল চোখ যেন জ্বলে প্রেমতারার। বলে,—সেদিন তোমার যদি সাহসে কুলোত মাস্টার, আজকের এ অবস্থা হতো না।

—আর আজ?

আঁটো জামাটা ঘামে ভিজে ওঠে। পীনদ্ধবুক ওঠা-নামা করে ঘন ঘন। এত অসহায় তবু সাহস হারায়না প্রেমতারা। বলে,—আজ আর হয় না।

—তবে এতদিন ধরে ঢলাঢলি করেছো কেন? কোন্ ভরসায় যখন তখন তাঁবুতে আসতে প্রেমতারা?

গোপীনাথের ঈষৎ প্রমত্ত দেহটা ঝুঁকে প্রেমতারার ওপর নেমে এসেছে প্রায়। হ্যাঁ। সেরকম করেছে বটে প্রেমতারা। করেছে বয়সের জ্বালায়, যৌবনের ধর্মে। গোপীনাথ বলে,

—বলো, প্রেমতারা।

—সেদিন মনোহরকে জানতাম না, মাস্টার।

কথা শেষ অবধি না শুনেই গোপীনাথ টানলো প্রেমতারাকে। আর টলে দুজনেই পড়লো মাটিতে। তাঁবুর মাটিতে দুর্বো-ঘাস। ঘাসে ধুলোয় মাখামাখি হয়ে গেল প্রেমতারার চুল। আর বুঝি পারেনা প্রেমতারা। অনেক শক্তিতে দু'হাতে ঠেলে দিলো গোপীনাথকে প্রেমতারা। গোপীনাথ তার গালে এক চড় মারলো। এত জোরে শব্দ হলো যে, প্রেমতারার যন্ত্রণার চীৎকারটাও যেন তেমন করে আর ফুটলোনা।

গালটা হাতে চেপে ঘাসে গড়িয়ে ওদিকে গিয়ে উঠে বসলো প্রেমতারা। গায়ের জামা ছিঁড়ে গিয়েছে, নীল চোখ দুটো জ্বলছে, এই মুহূর্তে প্রেমতারাকে কোনো ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতোই দেখায়। এতদিন যে-কথা বুকের কোটরে ছিলো, ক্ষিপ্ত প্রেমতারা সেই কথা আজ ছুড়ে দেয় গোপীনাথের মুখে। প্রায় চীৎকার ক'রে বলে,

—কেউ জানেনি, কোন সাক্ষী নেই। কিন্তু আমি দেখছিলাম, মাস্টার।

গোপীনাথের হাতখানা থাবার মতো নেমে আসে প্রেমতারার মুখে।

—চুপ।

অনেকদিনের ভয় ভেঙেছে। প্রেমতারা আর মানেনা। কাপড় গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে,—কোন্ মেয়েটাকে তুমি ছেড়ে কথা কয়েছ মাস্টার? আমি কোনদিনও ননী বা সিঁতির মতো তোমার পা ধরে কাঁদতে আসব না। সেটি জেনো।

বেরিয়ে আসে প্রেমতারা। আঁধার। তাঁবুর দড়ি-দড়া খুঁটি

বাধে পায়ে পায়ে। ফিরেও ছাখেনা। ছুটে চলে। বাদশার খাঁচার সামনে চৌকিতে .বসে নিবিষ্টমনে বাদশাকেই দেখছে মনোহর। সেখানে গিয়ে বসে পড়ে প্রেমতারা। রাত বাজে একটা। সার্কাসের মানুষ ঘুমোচ্ছে। প্রেমতারার দুঃসাহস দেখে ভয় পায় মনোহর।

কিন্তু কোন্ তুফানে প্রেমতারা এমন নোঙর ছিঁড়ে উপ্‌ড়ে এলো তার খবর রাখেনা মনোহর। সে শুধু বলে,—ছাখ্, বাদশার চোখ কি রকম চম্‌কাচ্ছে ?

এখন শুধু তারা দুজন। মনোহরের কাঁধে মাথা রাখে প্রেমতারা বলে,—দেখতে হয়—আজ তুই আমাকে ছাখ্ মনোহর। আমার চোখে চমক নেই ?

দড়া-দড়িতে এ দিকটা আঁধার করেছে এই যা। মনোহর গালে হাত বুলোতে গিয়ে চম্‌কে ওঠে।

—কি হয়েছে প্রেমতারা ?

—কিছু নয়। তুই আমার মুখের দিকে চা'। আমারে দুই হাতে ধর্। বেশ শক্ত করে ধর দিখিনি।

শুধু তো বাঘ নয়। প্রেমতারার মধ্যেও যে এমনি দুর্দাম উচ্ছ্বাস ছিলো তা কে জানতো! বিমুগ্ধ মনোহর। তার দুইহাতে পিষে বুকে চেপে কথা হারাতে হারাতে প্রেমতারা বলে,—তুই এমনিধারা ধরে রাখলে আমার কিসের ভয় ?

ভয়ের কথা কে ভাবছে ? ভরসার কথাই বা বলে কে ? ভয় নেই, ভরসা নেই—সব ছাপানো একটা অদ্ভুত অনুভূতির তরঙ্গে ভেসে যায় মনোহর। বুকের কাছে প্রেমতারাকে ধরে বলে,—এই বাদশা সাক্ষী, তুই আমার হলি, জানলি প্রেমতারা ?

—জানলাম।

—যদি বেইমানী করিস্ তো ঐ বাঘ্‌রে আমি খুলে দেবো—জানলি ?

—জানলাম।

—তবে মুখ ফেরা দিখিনি, একবার দেখি!

—পুন্নিমের চাঁদ এসে ধরা দিইছি, তবু মুখ না ফিরিয়ে দেখতে পারনা? তুমি কোন্ পীরিতের দোসর গো?

—আমি যে অমাবস্তে। আমার ঘরে আঁধার। আমি আঁধারে ভালো দেখি গো!

—ছাখ্, আঁধারে ছাখ্। ভালো করে ছাখ্।

বৃথাই গর্জন করে বাদশা। প্রেমনিরত দুটি নরনারীর কানে সে ডাক পৌঁছয় না। অরণ্যের প্রাণী বাদশা, মানুষের মনের হদিশ সে কেমন ক'রে পাবে? কেমন ক'রে জানবে যে এখন এই মুহূর্তে মনোহর এবং প্রেমতারা অরণ্যের চেয়ে অনেক আদিম এক প্রথম অনুভূতির নিগড়ে বাঁধা পড়ে অমন করে চেয়ে আছে চোখে চোখে? যৌবন যৌবনকে কামনা করলো, বুকে রক্তের দোলা মন্ত্রোচ্চার করলো। এত কথা না বুঝে শার্দুল গর্জে গর্জে ওঠে।

যাযাবর জীবনের একটা আশীর্বাদ আছে। সাংসারিক মানুষের অনেক মিথ্যা সংস্কারের শাসন থেকে তারা মুক্ত। তাই প্রেমতারা আর মনোহর যখন কেষ্টবাবুর মা-কালীর ছবির সমুখে মালা-বদল ক'রে এক তাঁবুতে বাস করতে এলো, তখন আর কেষ্টবাবুর পৌরোহিত্য সিদ্ধ কি অসিদ্ধ, সে প্রশ্ন তুললো না কেউ। যারা বেশ মধ্যবিত্ত ঘর থেকে এসেছে, আবার ফিরে গিয়ে যারা জোড়া-খাটে বিছানা পেতে ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে কলকাতা সেণ্টারের রেডিও খুলে দিয়ে বেশ নিটোল একটি জীবন যাপনের স্বপ্ন চোখে রাখে। তারাই হয়তো মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলো। কিন্তু চামেলী কিরণ, শশী, বিমল, সুকুলবাবু, রতিলাল, রাজুক, মেরী—এমনিধারা যারা সাতপুরুষে সার্কাসের মানুষ, তারা খুবই খুশী হলো। ট্রাপিজে দোলা খেতে খেতে, ছোরার ঝিলিক দেখতে দেখতে বা মোটর-সাইকেলে ঝাঁপ খেতে খেতে দুটি বেলা তারা সাক্ষাৎ মৃত্যুকে নিয়ে খেলা করছে। মৃত্যু যাদের নিত্যসঙ্গী, তুচ্ছ অনেক-কিছুই নিয়ে

তারা মাথা ঘামায় না। তাই অন্য-কিছু না ভেবে তারা শুধু আনন্দের ভাগটাই নিতে এলো। ছেঁড়া-ফুটো ফ্যামিলি-তাঁবু পাওয়া গেল একটা। শশীকে দেখে মনে হলো বিয়েটা তার-ই হলো। ফানুস এনে ছাড়লো দুটো। তাঁবুতে অজস্র ক্যালেণ্ডার এনে টাঙালো। মাসী আনলো বিছানার সুজনি চাদর। মেয়েরা আনলো হারিকেন হাঁড়ি কেটলি। কেষ্টবাবু একখানা স্টোভ দিলো। যদিও পুরোনো, কাজ ঠিকই চলে যাবে। কেষ্টবাবুর বিদুষী স্ত্রী চমৎকার মাংস রেঁধে আনলো।

যখন বেশ জমে উঠেছে, লালবাবু যখন গান ধরেছে, তখন গোপীনাথের হয়ে একগাছা হার দিলো প্রেমতারাকে কেষ্টবাবু। বললো,—গোপী গেছে শান্তাহার কাল ফিরবে।

মাসীকে নাচতে নামিয়েছে সবাই ধরে। হুল্লোড় চলেছে দারুণ। কেষ্টবাবু আস্তে বললো,—কি হয়েছে না-হয়েছে, সুখের দিনে মনে রাখিস্‌নে, তারা।

—তুমিও যেমন!

মাসীকে নাচতে দেখে ওদিকে লালবাবু ঝট্‌ করে একটু গরম হয়ে নিলো। তারপর হারমোনিয়ামের রেলা তুলে গেয়ে উঠলো।

চোখে চোখে হাসলো প্রেমতারা আর মনোহর।

॥ ৮ ॥

ফ্যামিলি-তাঁবুর সুখে সুখী মনোহরকে দেখে যেন চোখ জ্বলে যায় গোপীনাথের। বড় রুক্ষ মেজাজ হয়েছে গোপীর। বড় কর্কশ হয়েছে কথাবার্তা। প্রেমতারার প্রত্যাখ্যান পেয়ে, নিজের অপমানিত পৌরুষের জ্বালায় ক'দিন বড্ড বাড়ল গোপী। নিজের জ্বালা নিয়ে তাঁবুতে বসে থাকবে, সে-চরিত্র নয় গোপীর। আর ঘা-টা যে

কলিজায় লেগেছে তাও নয়। লেগেছে সম্মানে। আমি—গোপী-মাস্টার, আমাকে ছেড়ে ঐ নফরটাকে পছন্দ হলো তোর?

স্বভাব অনুযায়ী অভদ্র হয়ে উঠলো গোপী। কারু তোয়াক্কা রাখলো না। নতুন মোটর-সাইক্লিস্ট আসতে-না-আসতে বরখাস্ত করলো লালবাবুকে।

সকালবেলা রাউটির সময়। যে যার কাজে ব্যস্ত। এরিনার এক এক ধারে এক এক জন মহড়া দিচ্ছে। কলের পুত্‌লার মতো নতুন ছেলেমেয়ে ক'টা নোয়ান্ দিচ্ছে। মেয়েরা একচাকার সাইকেলে ঘুরছে। আলাদা তাঁবুতে মনোহর বাদশাকে খেলা শেখাচ্ছে। হাতী, উট, ঘোড়া সব চরতে বেরুচ্ছে চালকের সঙ্গে। হঠাৎ তীব্র একটা চীৎকার ফেটে পড়লো। চীৎকার করছে লালবাবু,

—আমায় ছাড়িয়ে দিয়োনি গোপী! গোপীবাবু, আমি তোমার গোলাম হয়ে রইবো। এই বয়েসে আমি কাজ পাবোনা গোপী!

পঞ্চাশ বছরের একটা মানুষ। চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে আর বাদামী মুখখানা দেখাচ্ছে যেন ভাঙাচোরা একটা কাদার তালের মতো। গোপী তাঁবুর ভেতরে। তার গলা শোনা যায় না। বড় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে সকালটা। মানুষগুলো লালবাবুর চীৎকার শোনে না। শুধুই নিষ্প্রাণ আজ্ঞাবহ যন্ত্রের মতো কাজ করে চলে। লালবাবু সকলের দিকে চেয়ে বলে,

—নয় আমি বোতল ছেড়ে দিচ্ছি, নয় আমি হলফ খাচ্ছি—তা ব'লে এ যে পেছন থেকে ছুরি মারা! তোমরা বল না গো! হ্যাঁ কেষ্টবাবু!

একটা মানুষ, যার চেয়ে বড় সৃষ্টি নাকি ভগবানের নেই, তাকে এমনিধারা ভাঙাচোরা দেখতে মরমে মরে যায় মনোহর। লালবাবুর কথাগুলো তার বুকে গিয়ে কেটে কেটে বসে।

সকলের মুখের দিকে বৃথাই চায় লালবাবু। কেউ কথা কয় না। সার্কাসে এতগুলো মানুষ। কারু গলায় এতটুকু সাড় পায়না

লালবাবু। আর এই নিরুত্তরের সম্মুখীন হয়ে লালবাবু যেন সর্বনাশ ছাখে। . তারপর কিছু না বলে টলতে-টলতে চলে যায় নিজের তাঁবুতে।

রাউটি-নিরত মানুষগুলোর 'সামনে এবার এসে দাঁড়ায় গোপীনাথ। দুই পেশল পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকে প্যাণ্টের পকেটে হাত পুরে। শূন্যে ছোরা ছুড়ে বুকের ওপর লুফে নিতে আজ আর রতিলালের মৃত্যুভয় হয় না। মনে হয়, তাঁবুর দেয়ালে ছবি টাঙিয়ে যে-ভগবানের পুজো করেছে রতিলাল, সে ভগবান যেন সত্যি নয়। তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী ঐ গোপীনাথ, যে নাকি তার ইহজীবনের হর্তাকর্তা। রাখলে রাখতে পারে। আর নয়তো ঐ লালবাবুর মতো করে গোটা মানুষটাকে ভেঙে দুমড়ে ফেলে দিতে পারে।

গোপীনাথও বোঝে যে, এখন এই মুহূর্তে এই মানুষগুলো তাকে কী চোখে দেখছে। মদমত্ত কোনো বুদ্ধিতে সে হাতের ছপ্‌টি বাতাসে হাঁক্‌রে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,—ঈস্টার্ন-সাইকেল কিচ্ছু হচ্ছে না। আবার! আবার করো!

তারপর মনোহরের তাঁবুতে যায় গোপীনাথ। বলে,—কাম আউট!

মনোহর বেরিয়ে আসে। গোপীনাথ বলে,—লালবাবু পুরোনো সার্কাসের লোক। জানোয়ারকে সেঁকো-বিষ দিয়ে পালাতে পারে। তুমি চোখ রাখবে।

—আমি চোখ রাখব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমি চোখ রাখবে। উটের কীপার ব্যাটা উল্লুক, তার জ্বর হয়েছে। কোন্ সময় সেঁকো-বিষ দেবে আর লস্ খাবো আমি।

সার্কাস-কুইন যার হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুম যায় রাতে, তার পৌরুষ এই অপমানে ঘা খায় বৈকি। উটের কীপার যদি

অসুস্থ হয়, তো জানোয়ার দেখবার জন্যে আরও মানুষ রয়েছে। কে কবে শুনেছে সে-খবরদারি মনোহরকে করতে হবে? কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এমন কোনো শর্তে টিপ-ছাপ দেয়নি মনোহর। তবু কথা কয়না। অপমান হজম করে। বলে,—দেখবো।

প্রেমতারার প্রেমিককে অপমান ক'রে যতটা তৃপ্তি হবে ভেবেছিল গোপীনাথ, তা হয়না। এবার চলে যায় অন্যদিকে। সেখানে দুই ছোকরা একখানা কালো কাপড়ে সাদা রং দিয়ে যুবতী মেয়েছেলের চেহারা আঁকতে হিমশিম খাচ্ছে। মেয়ের পরনে স্বল্পবসন। পায়ের কাছে বাঘ এবং হাতে ও গায়ে প্যাঁচানো অজগর সাপ। কিন্তু এই দুই ভয়ঙ্কর আরণ্যকের মাঝখানে দাঁড়িয়েও মেয়েটির মুখে হাসির কম্‌তি নেই। কোনো আশ্চর্য ম্যাজিকে তার কানের দুল বা চুলের পাতাবাহার এতটুকু এদিক-ওদিক হয়নি। আজ গোপীনাথের কেবলই প্রভুত্ব ফলাতে ইচ্ছা যায়। গোপী দেখতে দেখতে হাসে। বলে,—টানটোনগুলো দিব্যি ফুটিয়ে দিন, সার। যাতে ক'রে বেশ চোখ পড়ে অডিয়েন্সের।

সার্কাসের মালিক 'সার' বললো? ছোকরাদের গর্ব হয়। গোপীনাথ চলে গেলে বলে,—দেখলি! 'আর্টিস্টকে সম্মান করতে জানে, হ্যাঁ!

যাবার আগে লালবাবুর তাঁবুতে না গিয়ে পারেনা মনোহর। এতদিন লালবাবু চলতো ফিরতো মেজাজী ভাবে। মদের নেশায় হাত কাঁপতে কাঁপতে মোটরসাইকেলটা নিয়ে মরণ-গ্লোবটা ঘুরে আসবার সময় যে কোনদিন দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো। কিন্তু সে সময় লালবাবুকে এমনধারা দেখা যায়নি একদিনও। আজকে লাল-বাবুকে যেমন বিধ্বস্ত, তেমনই বুড়ো দেখায়। সাধের হারমোনিয়ামটা বাজিয়ে কতদিন লালবাবু চামেলীদের তাঁবুতে বসে গান গেয়েছে—

'গোলাপ তব সমতুল নাহি অন্য কোন ফুল
এ তিন ভুবন মাঝে গো।
বাবুদের কোটে, ব্লাউজে জ্যাকেটে
শোভিছ গোলাপ কেমনে গো।'

আর এই বেলোয়ারী গান শুনে মাসী রাগ করেছে। বলেছে,—কেন, সেই 'সাঁঝের তারকা'র গান জাননা ?

আজ হারমোনিয়ামটায় চামেলীর হাতে তৈরী রঙীন ওয়াড়টি পরিয়ে পাশে বসে আছে লালবাবু। মনোহরের বড় দুঃখ হয়। বলে,—আপনি অন্য সার্কাসে চান্স পেয়ে যাবেন সার।

এককালের দুর্ধর্ষ মোটর-জাম্পার আলফ্রেডের শিষ্য লালবাবু। নিজেও সদাসর্বদা খাকি শার্ট প্যান্ট পরে জুতো এঁটে ঘুরেছে। সম্ভ্রমেই তাকে 'আপনি' বলেছে মনোহর। লালবাবু নানা জায়গায় ঘুরেছে, এককালে 'স্টার সার্কাস'-এর স্টার লায়ন-কুঈন সুন্দরী অ্যালিসের সঙ্গে প্রেম করেছে। খেয়ালে মেসোপটেমিয়ায় লড়েও এসেছিল প্রথম যুদ্ধের কালে। অনেক দেখেছে লালবাবু। তাই মনোহরের মতো মানুষদের সে তেমন চেয়ে ছাখেনি। আজ কিন্তু কোনো আপত্তি করলো না। বসতে দিলো মনোহরকে। গলার উঁচু হাড়টা একটু উঠলো নামলো। তারপর বললো,—হাত কাঁপে। হ্যাণ্ডেল ধরতে পারিনা।

—নেশাটা যদি ছেড়ে দিতেন স্যার।

মনোহরের দিকে টকটকে লাল চোখে তাকায় লালবাবু। তারপর বলে,—ভয় করে। তাই নেশা না ক'রে গ্লোবে ঢুকতে পারিনা। হাতদুটো যেন বশে থাকেনা।

সেঁকো-বিষ দিয়ে সার্কাসের জানোয়ারকে খতম করে যাবার কথা এই মানুষটার সম্পর্কে ভাবতে পারেনা মনোহর। তার সমব্যথী দৃষ্টিটা অনুভব করে লালবাবু যেন নড়েচড়ে একটু সামলায়। এতকালের মতোই হালকাভাবে কথা কইতে চায়। বলে,—সার্কাসে

এইরকমই হয়। অকেজো হলে কি রাখবে তোমাকেই? বুড়ো হয়েছ কি গেট্-আউট্। ব্যস—খেল্ খতম, পয়সা হজম। অথচ, অথচ এই আমাকেই একদিন অন্য জায়গা থেকে ভাগিয়ে এনেছিল গোপী। সে সার্কাসে আমার শেয়ার অবধি ছিল।

বলতে বলতে লালবাবুর গলার স্বর আর চোখের নজর কোথায় যে চলে যায়! কপাল কুঁচকে বলে,—সে কতদিন হয়ে গেল, বাপ্‌রে—সে কি আজকের কথা। তখন যা-যা কাজ করিছি ভাবলে ভয় করে। আজ কি আমার সে-দিন আছে?

—কি করেছিলেন সার?

—বর্ষায় ভেসে যাচ্ছে পথ, বম্বে-পুনার রাস্তা। মোটর চালিয়ে গিইছি আলফ্রেড আর মোহিনীকে নিয়ে। বম্বের মেয়ে মোহিনী। ড্যাগার-ডান্স করতো। স্বামীকে ছোরা মেরে ক্যাশ ভেঙে পালিয়েছিলো আলফ্রেডের সঙ্গে। আবার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে বাঘ ধরতে গিইছি আকুলি কোম্পানীর হ'য়ে। সি. পি.-র জঙ্গল। কণ্ট্রাক্টারকে খুন করলো কুলীরা, আর সেই মড়া কাঁধে ফেলে আমি থানায় জমা দিতে গেলাম। কামানে পুরে মানুষ-ছোড়ার হুজুগ উঠলো তো, জার্মান সার্কাস থেকে খেলোয়াড় ভাগিয়ে আনলাম।...আজ কি সেই বয়স আছে?

লালবাবুর চোখ দিয়ে জল পড়ে। একদিনের দুর্ধর্ষ বেপরোয়া লালবাবু নয়। যে-কোন অসহায় ও নিরাশ্রয় বুড়োমানুষেরই মতো দেখায় তাকে। বলে,—তা ছাড়া এই' সার্কাসেই কাটালাম এতদিন। নিজের একখানা বাইক অবধি কিনলাম না। গোপী কিছুই বিবেচনা করলে না। বয়স হয়েছে, তাই ছাড়িয়ে দিলে এমন করে।

এত দুঃখ নিয়েও লালবাবু এরিনায় দাঁড়ায়। লাল টিউনিক। পেতলের তারাগুলো মালার মতো ঝকমক করছে। মাথায় টুপী। মরণ-গ্লোবটায় ঢোকবার আগে একবার টুপী খুলে অভিবাদন করে

নেয়। সামনে দাঁড়িয়ে গোপীনাথ। তাকে বলে,—আজ একফোঁটাও মদ খাইনি, জানলে গোপী?

সে কথা আজ কে শুনতে চায়? এ জ্ঞান আগে হয়নি কেন? কিছু বলেনা গোপী। ঘড়ি দেখে স্টার্ট নিতে বলে গোপী। ঘড় ঘড় ক'রে ঢুকে যায় লালবাবু। এরিনার পেছনে দাঁড়িয়ে মনোহরের একবার মনে হলো, কোনরকম গোলমাল হবেনা তো? না। কোন গোলমাল হলো না। প্রাক্তন সৈন্য লালবাবু। সৈন্যদের মতোই নিজের কর্তব্যে এতটুকু হেলা করলোনা। চমৎকার খেলা দেখালো। গ্লোবটার গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে চমৎকার ভাবে চক্র সম্পূর্ণ করে যতবার এলো, ততবারই হাততালির ঝড় উঠলো দর্শকদের মহল থেকে।

কিন্তু ওদিকে গোপীনাথ অধৈর্য। লালবাবু বাঁধা সময়ের ওপরেও অনেক সময় নিয়েছে। এখনো কেন থামছেনা?

সত্যিই, তখন লালবাবুর আস্তে আস্তে স্পীড কমিয়ে আনবার কথা। তার বদলে সে বাড়িয়ে দিলো স্পীড। বাড়িয়ে দিলো কি? না, সমান তালেই ঘুরতে লাগলো? এবার প্রমাদ গুণলো গোপী। কেষ্টবাবুর নির্দেশে ব্যাণ্ড বেজে উঠলো জোরদার। গ্লোবের পাশে এসে গোপী ডাকলো,—লালবাবু! লালবাবু!

কে সাড়া দেবে! হ্যাণ্ডেলটা ধ'রে লালবাবু কি যে বিদ্যুৎগতিতে ঘোরাচ্ছে সাইকেলটা, না দেখলে বিশ্বাস করা যায়না। অসহিষ্ণু গোপী গ্লোবের গায়ে ছড়ি ঠুকল। থামলনা লালবাবু। ইঞ্জিন গরম হয়ে গিয়েছে। মোটর-সাইকেল সমানেই গজরাচ্ছে। হ্যাণ্ডেল ধরে কি অজ্ঞানই হয়ে গেল লালবাবু? বোঝা যায়না।

লালবাবুর অন্য মতলব ছিল। আজকে শো-এ নামবার সময়ই মন ঠিক করে এসেছিল কি? জবাব দেবে কে? লালবাবুর মতলব ধরে ফেলে গোপীনাথও সাময়িকভাবে সব ভুলে গেল। হাতের ছড়ি ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো,—পাগল হয়ে গিয়েছে লালবাবু। গেট খুলে দে। ওকে বের ক'রে আন্।

কে বের করবে ? সার্কাসের মানুষ বিপত্তি বুঝে ব্যাণ্ড ঝমঝমিয়ে তুললো। আলগা নাক পরে চারজন ক্লাউন ডিগবাজি খেতে খেতে চলে এলো এরিনায়। দর্শকরাও গুনগুন করছে।

এইবার বুঝি ঘটলো দুর্ঘটনা। কিন্তু না। পাগলামির সেই অবস্থা থেকে স্পীড কমাতে শুরু করলো লালবাবু। বেয়াল্লিশ সালের মডেল হারকিউলিস গর্জন কমাতে লাগলো। গর্জন কমাতে কমাতে সাইকেলটা ধুঁকতে-ধুঁকতে ক্রুদ্ধ অথচ বৃদ্ধ ও অক্ষম কোনো শ্বাপদের মতোই মুখ থুবড়ে পড়লো। আর গড়গড় করে গ্লোব বের করে নিয়ে চললো মনোহর-রা।

গোপীনাথের আতঙ্ক এবার ক্রোধ হয়ে ফাটলো লালবাবুর ওপর। শশী আর চামেলী প্রোগ্রামের গোলমাল ঢাকা দিতে সাইকেল নিয়ে ঢুকলো এরিনায়। শশীর কাঁধে দাঁড়িয়ে চামেলী, আর একচাকার সাইকেলে শশী। ওদিকে কালো টিউনিকের বোতামগুলো ফুলিয়ে গোপীনাথ মানুষের বেইমানির কূলকিনারা খুঁজে অবাক মানলো,

—এই আপনার মনে ছিল, অ্যাঁ। অ্যাক্সিডেণ্ট করে বিপাকে ফেলবেন সার্কাসকে ? নয়তো এমন সর্বনাশা কাণ্ড কেউ করে ? কাল-ই চলে যাবেন। জানলেন লালবাবু ? অমন সর্বনেশে মাথা আপনার ?

হারকিউলিসে ব'সে মাথা গুঁজে সব শুনলো লালবাবু। তারপর হঠাৎ বিশ্রীভাবে কেঁদে উঠলো,—আমাকে একেবারে খতম করে দিয়েছে জানলে মনোহর ? এতটুকু সাহস নেই আমার। মরতে অবধি পারলাম না। ভয় পেলাম।

নিষ্ফল প্রচেষ্টার ব্যর্থতা লালবাবুর চোখের জল অবধি শুষে নিয়েছে। গায়ে যেন জোর নেই। বিনা চোখের জলে, ভাঙা আর বরবাদ মানুষ লালবাবু বার বার বলতে লাগলো,—মরতে অবধি পারলাম না, হ্যাঁ, মনোহর দেখলে তো ? একেবার শেষ হয়ে গিইছি ? অ্যাঁ, সাহসে কুলোলো না।

তার পর মুখখানা তুলে শুধোল,—আমার কি হবে!

সাড়া করলোনা কেউ। লালনীল টিউনিক পরে যে যার কাজে যাচ্ছে। সকলের দিকে চেয়ে আর্ত কণ্ঠে আর্জি করলো লালবাবু কি হবে আমার? তোমরা বলনা কেন?

যাবার সময় কিন্তু আর গোলমাল করলো না লালবাবু। সার্কাসকে মিষ্টি খাওয়াবার জন্যে মাসীর কাছে টাকা রেখে গেল। হারমোনিয়ামটা রেখে গেল মাসীর জন্যে। বললো,—তুমি বাজিয়ো।

—আমি?

—একদিন কিন্তু বাজাতে, বিনোদ!

যৌবনের বিনোদবালা দুর্ধর্ষ মোটর-সাইক্লিস্ট লালবাবুকে চিনতো। অন্য দিনে। অন্য পরিবেশে। সেদিন কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিলো না। পুরোনো পরিচয়ের দাবি-ও মাসী করেনি। আজ লালবাবুর কথা শুনে মাসীর চোখে জল এলো। কোটের হাতা ধরে মাসী বললো, —এরা বুঝবে না! জানলে লালবাবু? তুমি চলে গেলে মনটি আমার কাঁদবে। আমি সইতে পারবো না। এরা কি জানবে বলো পুরোনো কথা!

শ্যামাকান্তর সার্কাস-যুগের দুই মানুষ পরস্পরের মনের দুঃখ ভাগ ক'রে দু'পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর নিশ্বাস ফেলে চলতে শুরু করলো লালবাবু। মাসী বন্ধুর মতো বললো,—একটা দোকান দিয়ো কি ঝা হয় কোরো, খেলা আর দেখিয়ো না, জানলে?

লালবাবুর টাকা দিয়ে একদিন মাসী লুচি-মিষ্টি খাওয়ালো সার্কাসকে। হারমোনিয়ামটা আনলো নিজের ঘরে। ক'টা দিন মাসীই যা ফোঁস-ফোঁস করে কাঁদলো। ক'দিন বাদে যখন নতুন মোটর-সাইক্লিস্ট এলো, তাকে দেখে আলগা হয়ে রইলো মাসী দু'দিন। তারপরেই আলাপ পরিচয় করলো। মাসীকে 'মাসী' আর চামেলীকে 'দিদি' পাতিয়ে সুখেন বক্সী শশীদের তাঁবুতে বেশ আপন

হয়ে উঠলো। একদিন খাওয়া-দাওয়া হলো। আবার অন্যদিন মাছের টুকরো নিয়ে তুমুল কলহ করে বসলো সুখেন আর সাম্বো। মাসীকে চামেলী বললো,—তোমার নতুন বোনপোর আড় ভাঙছে গো! কেমন ঝগড়া করছে ছাখোসে।

শশী বৌ-কে বললো,—কেন, তোরও তো দাদা। কটা রঙ দেখে কেমন হেলে পড়েছিলি মনে নেই?

মা-ছেলে একদলে হলো দেখে চামেলী একমুঠো লঙ্কা ডালে ফোড়ন দিয়ে ঝাঁজ তুললো। বললো,—তোমার মনে কু।

সুখেন ছেলেটা হাড়-ঝগড়াটে। তার নিরন্তর চ্যাঁচামেচির ফলে লালবাবুর কথা মনে করতেও সময় রইল না কারোর। আর, অনেক বাঁচবার ইচ্ছে নিয়েও লালবাবু আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এলো মানুষের মনে।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, পরিণামে লালবাবু মদ নেশা ছেড়ে ছোট একটা দোকান দিলো। অনেক দিন বাদে প্রেমতারা-র সঙ্গেই দেখা হয়েছিলো তার।

জীবন কেমনধারা রঙীন হয়, যারা দেখেনি, গোপীনাথের সার্কাসে আসুক। শান্তাহার থেকে রংপুর, রংপুর ছেড়ে রাজসাহী, আবার ফরিদপুর চলেছে পার্টি। হাতী, ঘোড়া, উট, বাঘ, সিংহ। দামী জানোয়ার বাঘ-সিংহ। জায়গা আর জল-বদলের ঠেলায় পড়ে তাদের জান কমে যায়। তাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে ঐ-যে জোয়ান-দেহ মানুষটি ছবি আঁকা গেঞ্জী আর ডোরাকাটা প্যাণ্ট পরে তাদের খাঁচায় লাফিয়ে উঠলো, ও-ই মনোহর। আর মেয়েদের ঝাঁকের মধ্যে দাঁড়িয়ে কটা-রঙ, কটা-চোখের যে-মেয়েটি পান খাওয়াচ্ছে সকলকে আর পানওয়ালার সঙ্গে মস্করা করে হেসে আকুল হচ্ছে, তারই নাম প্রেমতারা। কালো কালো মেয়েগুলি যে যার স্যুটকেস বগলে দাঁড়িয়ে। এখন দেখতে নেহাতই সাদামাটা। কিন্তু

সন্ধ্যেবেলা ওরা-ই দড়ির দোলনা ধরে ঝাঁপ খাবে। মুখে রঙ মেখে জরির জামা পরে জাপানী ছাতা নিয়ে তারের ওপর নাচবে। আর ঐ যে তেরো বছরের রোগা মেয়ে শিউলী হারাণের সঙ্গে একপাশে হয়ে কথা কইছে, ও কেমন চলন্ত হাতীর পিঠে নাচবে। আরবী ঘোড়ার ওপরে দাঁড়িয়ে ঘোড়াকে আগুনের বেড়া ঝাঁপ খাওয়াবে। গোপীনাথ যদি কিছু সান্ত্বনা পেয়ে থাকে তো ঐ শিউলীর মুখ চেয়ে। সকলেই বলছে প্রেমতারার পরে আর কেউ নয়, ঐ শিউলী-ই উঠবে। ভয়ের জড় ভেঙেছে। বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা জাতে আর্টিস্ট। কিরণের কোলে আজ একটা উলের টুপী পরা ছেলে। কাজলের টিপ পরে হাবার মতো চেয়ে রয়েছে। সন্ধ্যেবেলা ছেলেকে মাসীর কোলে দিয়ে ঐ কিরণ-ই এরিনায় ঢুকবে বর্মী মেয়ে সেজে। 'চমকে চমকে ধীরু ভীরু পায়—পল্লীর বালিকা বনপথে যায়, বালা বনপথে যায়' এই গানের সঙ্গে কিরণ নাচবে ভালুক নিয়ে। ভালুকও কিরণেরই মতো সাজ করবে। আর দুই পাশে সাম্বো জাম্বো তখন এমন কাণ্ড জুড়বে যে, হেসে হেসে দম ছুটে যাবে দর্শকের। কোন্‌টা রাখে কোন্‌টা দ্যাখে!

গোপীনাথ আর কেষ্টবাবুর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে এই চলমান মিছিল এখানে ওখানে যেখানেই যাক না কেন, দু'দিন গোছ ক'রে নিয়ে তিনদিনের দিন ঠিক দেখবে যে সন্ধ্যেবেলা বাজনা বাজছে। সার্কাস জমে উঠেছে। মফস্বল শহরে যে-সব মানুষ সারাবছরে বৈচিত্র্যহীন জীবন কাটায়, তাদের মেয়ে-বৌরা তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে দু'বেলার কাজ সেরে নেবে। ছেলেপিলেকে দুপুরবেলা শুইয়ে দেবে। নইলে সন্ধ্যেবেলা সার্কাসে জাগবে কেমন করে?

যারা লাখ লাখ মানুষকে এমনি করে আনন্দ দেয়, তাদের জীবনে আনন্দ নেই কি? আছে তো! নইলে রাজ্যের সুখ যে এসে প্রেমতারার তাঁবুতে বাসা বেঁধেছে। একমাস দু'মাসের বেশী মেয়াদ নয় কোথাও। তবু প্রেমতারার তাঁবুতে কেমন কাগজের

গোলাপফুলের তোড়া। সায়েবদের ঘরকন্না দেখে এসেছে মনোহর। ঘর সাজাবার নানা কথা সে জানে।

কাঁচের বোতলে খল্‌সে মাছ খেলা করে। টিয়াপাখী দাঁড়ে বসে ঝাপট খায়। সবুজরঙের কাকাতুয়া-লণ্ঠন। ব্যাটারীতে টিপলে আলো জ্বলে। স্টোভ জ্বেলে চা করে প্রেমতারা। রাজুকের বৌ ঐ কিপ্‌টে মেরী-র মতো কেটলী নিয়ে মেসের চাকর হারাণকে সাধেনা। প্যাকিং বাক্সে ঢাকনা দিয়ে চা সাজিয়ে তারিয়ে তাকিয়ে খায়। বাঘ-ছাপা জাপানী মাতুর পেতে রাখে বিছানায়। তোলা-উনুনে মাংস রাঁধে। কিমার বড়া ভাজে। আচার দেয় লেবুতে নুন মাখিয়ে। মনোহরকে বলে,—ভালো ক'রে না খেলে শরীর টিঁকবে না।

দুজনে ঘর বেঁধেছে। কিন্তু ঘরে থাকবার সময় কতো কম। লায়ন-ট্রেনার মনোহর। আর সার্কাসের সেরা আকর্ষণ বাদশার দায়িত্ব তার ওপর। বাদশার চামড়া টান-টান। চক চক করে কালো ডোরাগুলো। মস্ত খাঁচার ভেতরে দু'কদম ঘুরে আসে বাদশা। দিনে দিনে বিশাল হয়ে উঠেছে বাদশা। এক মনোহর ছাড়া তার ধারে কেউ ঘেঁষতে পারেনা। প্রেমতারাকে সে তবু সহ্য করে। তা-ও মনোহরের অনেক চেষ্টার পর। ঘাড় মোটা হয়েছে বাদশার। চোখ দুটো দিনের বেলা যেমন সবুজ, আর রাতে জ্বলে আসমানের তারার মতো। আর যৌবনে পড়তে বাদশার হাঁকার এমন বাড়লো যে, গর্জনে তেষ্ঠানো দায়। থেকে-থেকেই ডেকে উঠবে বাদশা পেট টেনে, নিশ্বাস ছেড়ে। প্রেমতারার সাধ হয় কানে তুলো দিয়ে রাখে। বলে,—কী হতভাগা হিংসুটে জানোয়ার গো!

একদিন প্রেমতারাকে আদর করতে করতে মনোহর যেন আর সইতে পারলে না। কেষ্টবাবুর কাছে গেল। বললো,—কেষ্টদা, একটা বাঘিন্ কিনবে?

—তুই টাকা দিস্।

—ঠাট্টা নয়, কেষ্টদা। মাদী আনলে বাদশার জোড়ী হবে। আর বাচ্ছা হ'লে পরে তোমাদের লাভ বিনে লোস্‌কান নেই।

যুক্তি আছে। গোপীও মানলো। বললো,—এখন ঝট্‌ করে তিন চার হাজার টাকা খরচ করতে পারবো না। আর একটা বছর যাক্‌। কিনবো। তবে ঝামেলা পোয়াবে কে?

মনোহর ঝামেলা নিতে খুব রাজী। এদিকে বাদশা যেন বড়ই গরম হয়ে উঠলো। এরিনায় গিয়ে তার মুখে মাথাটি দিতে ভয় হয় প্রেমতারার। মনোহরকে বলে,—হাজার হলে-ও জানোয়ার। বিশ্বাস কি?

সত্যি কি বিশ্বাস করা চলেনা বাদশাকে? অদ্ভুত এক ভাল-বাসার মন নিয়ে জন্মেছে মনোহর। কি বাদশা, কি প্রেমতারা—দুজনকেই সে বিশ্বাস করতে চায়। একদিন এরিনায় বাদশা এমন বিগড়োল যে, প্রেমতারা মনোহরের ওপরে ফেটে পড়লো। টকটকে লাল হলো মুখ। চোখ ঝিলিক দিলো। লাল ঠোঁট আর সুন্দর দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথাগুলি বেরুল চোখা-চোখা। মনোহর অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বললো,—তুই-ই তো এক বাঘিনী রে। ব্বাপ্‌ রে! মেয়েমানুষের এত রাগ?

কিন্তু গোপীনাথও ধমকে দিলো মনোহরকে। সার্কাসে এমন ছেলেখেলা করবার কথা নয়। বেগতিক বুঝে মনোহর আফিম রতি ক'রে দিতে শুরু করলো বাদশাকে। খাঁচা ঢাকলো কালো কাপড়ে। সে নাগিয়ার মতো খুনে নয় যে, আষ্টেপিষ্টে শিকল বেঁধে ইলেক্‌ট্রিক চাবুকে মারবে বাঘকে। তার চেয়ে নেশা ধরানো ভালো।

বাদশা যদি অত সময় নেয়, তবে প্রেমতারার সইবে কেন? মানিনী ঠাট করে শুয়ে থাকে ক্যাম্প-খাটে। হেসে হেসে বলে, —বাদশা রইতে আবার আমার সঙ্গে ঘর বাঁধলে কেন গো? ওর সুখ-সুবিধে দেখতেই তো দিন কাটে তোমার।

—কেন গো, ঘরের মানুষকে হেলা করিছি ?

—করনি ?

—কি করলাম ?

—ছাখো হাতে পায়ে রঙ নেই। কেমন সাদা।

—দাওনি কেন ?

—কে দেখবে ?

—কেন, আমি ?

চোখে হাসি নিয়ে প্রেমতারা গান করে—

'দেখবে যে জন, সেই সাজাবে, এই গোকুলের রীত্
নইলে কিসের পীরিত ?'

—বটে !

মনোহরও কম যায় না। রঙ নিয়ে ব'সে প্রেমতারার পায়ের নখ ক'টি রাঙায়। বলে,—তোর পাপ হলো।

—আর তুই বর্তে গেলি বল্ ?

মনোহরও চোখে হাসি নিয়েই চেয়ে থাকে। হ্যাঁ সে ধন্য হয়েছে। সার্কাস-কুঈনের রাঙা পা-দুখানা কোলে নিয়ে বসে সে ধন্য হয়েছে। বলে,—ছুটি চাইলে তোকে দেবে মাস্টার ?

—কেন গো ?

—তবে তোকে নে' দেশ বেড়িয়ে আসতাম, তারা। কেমন সায়েবদের চা-বাগান। কেমন ঘরদোর সাজানো। গলায় সিল্কের রুমাল দে' আমরা 'টকি' দেখতে যেতাম।

—বড় যে সাধ !

—নয় সমুদ্দুর দেখতাম তারা। সায়েবের সঙ্গে গে' দেখে এইছি পুরীতে। ব্বাপ্ রে ঢেউ ! দেখে তাজ্জব মান্তিস তারা !

—মাস্টার ছুটি দেবে না গো। আর অমনধারা উড়ে-পুড়ে ঘুরতেও আমার ভালো লাগে না।

—কি ভালো লাগে ?

—চামেলী দিদির মতো সংসার পাততে।

সত্যি, ছেলেপুলে নইলে সংসার? যেন বেদের ঘর। তবে সে-কথা প্রেমতারারই মনে হয়। মনোহর বলে,—তোকে ওসব মানায় না তারা।

—কী মানায়?

বলতে পারে না মনোহর। প্রেমতারা যেন পৃথিবীর সব-কিছুর চেয়ে সুন্দর। রক্ত মাংসের শরীরে যেন রূপের আগুন বাসা বেঁধেছে। অনেক কথা জানে না মনোহর। চেয়ে থাকতে থাকতে বলে ওঠে,—ভগবান ঢেলে টাকা দেয়, তো তোর পায়ে আমি দুনিয়াটাকে এনে দিই, তারা। যা মন হয় পর্, যেমন মন হয় সাজ। সিনেমায় মেয়েরা কেমন সাজে!

—চুপ যা। ত্মাখ্, রাত আর দুই পহরও নেই। রাউটির ঘণ্টা পড়বে'খন ভোরে।

কোনদিন বা ঘুমোতে মন যায় না মনোহরের, গান গায় আস্তে ক'রে। প্রেমতারার গানের গলা নেই। মনোহরের আছে। যাত্রাদলে সখী হয়ে ছোটকালে নাম কিনেছিল মনোহর। আলগা কাঁচুলি আর মালা-আঁটা পরচুলো প'রে নাচতে হতো। বেশ খাসা সব গান শিখেছিল। সেই গান-ই গায় মনোহর, আর প্রেমতারা বুকে লেপটে শোনে—

'প্রেমের কলসী কাঁখে প্রেমনগরের বালা
প্রেমের নদীতে জল ভরিতে যায়'।

কিংবা—

'ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ আকাশের গায়ে তারা-ফুল মোরা
ফুটিয়া রই।'

আবার যেদিন শশীদের সঙ্গে একটু ফুর্তি হয়, সেদিন মনোহরের কিছুই ভালো লাগে না। অস্থির করে তোলে প্রেমতারাকে। বলে, —কোন কথা শুনবো না যা। তুই কাছে আয়।

মনোহরের বুকে প্রেমতারার মুখ। তার চেয়েও কাছে কেমন করে আসে মানুষ? অবুঝ মনোহর বলে,—আরো কাছে আয়।

—কোথায়?

ফিস্‌ফিস্ করে শুধোয় প্রেমতারা।

কোথায় তা কি মনেহরই জানে? বলে,—আমার বুকের মধ্যিখানে এসে বোস্।

তাই তো বসেছে প্রেমতারা। তবু অবুঝ মনোহর নিশ্চিন্ত হয় না। সে-রাতে ঐ দুখানা হাতে কয়েদ হয়েই ঘুমোতে হয় প্রেমতারাকে। এমনি সব রাতে, নিজের দুখানা হাতের মতো আর কোন আশ্রয়ই যেন নিরাপদ বোধ হয় না মনোহরের। আর, অদ্ভুত নির্ভরে চুপ করে থাকে প্রেমতারা।

॥ ৯ ॥

এমনিধারা সুখ-সৌভাগ্যের কাহিনীতেই যদি ফুরিয়ে যেতো, তাহ'লে সে হতো গল্প। সুখের ঘরে বাসা বেঁধে বাস করে গল্পকথার মানুষ। বছরখানেক বড় সুখে কাটলো প্রেমতারার। এই চলমান মিছিল ঘুরলো বগুড়া, পাবনা, রংপুর। তারপরে মালদ'তে আমের মৌসুমে বেশী লাভের আশায় গিয়ে বড় চোট্ খেলো গোপীনাথ। অসুখ ক'রে মরে গেল মাদী হাতী একটা। মন করলেই যে হাতী পাওয়া যাবে তা নয়। যুদ্ধ লেগেছে। আসাম-বর্মাতেই হাতীর দরকার এখন। হাতী চালান দিতে মুশকিল। আরো কি— গোপীনাথের নিজের শেখানো হাতী ছিলো। তেমনটি ক'রে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া মুশকিল। গরম পড়ে জল টানতে সুরু করেছে। এ সময় জায়গা এমনভাবে ঘন ঘন বদল করলে পরে ম'রে যাবে জানোয়ার। তবু শুনলো না গোপী। সার্কাস নিয়ে এলো মুর্শিদাবাদ-

বহরমপুর। ভাগীরথীর জল টেনে ঐ কোন্ নিচে গিয়ে ছলছলিয়ে বয়ে চলেছে। খাগড়াঘাট থেকে নদী পেরিয়ে আসতে বালির চড়া ভাঙতে হলো এই এতখানি। লালদীঘির পাড়ে মস্ত মাঠে তাঁবু পড়লো।

ভরা চৈত্রমাস। বিকেলে ঝড়বিষ্টির চিহ্নমাত্র নেই। অকরুণ একটা আকাশ আগুন ঢালছে। ধুলোয় সাদা চারি পাশ। লাল-দীঘির গভীর কালো জলে নাইতে নেমে হাতীগুলো উঠতে চায় না। পাইপ লাগিয়ে দীঘির জল তুলে চারিদিকে ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করতে চায় মনোহর। গরম পড়ে কেমন যেন অসহায় হয়ে ধুঁকছে বাদশা। খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। দুই কপিশ চোখে অনেক অভিযোগ নিয়ে চেয়ে থাকে থাবায় মুখ গুঁজে। এ যদি জঙ্গল হতো তবে গুহার শীতল আঁধারে বা ঘন গাছের ছায়ায় গিয়ে জুড়োতে পারতো বাদশা। জঙ্গলের নিরালা জলাশয়ের ধারে গুঁড়ি মেরে জল খেতো, আর তার পেশল দেহের প্রত্যেকটি গতিভঙ্গীকে অভিনন্দন জানাতো কোনো বাঘিনীর আসঙ্গকামী সবুজ চোখ। কিন্তু এই মানুষের জঙ্গলের মধ্যে এতটুকু বিশ্রাম বা শীতলতার বরাভয় নেই। তাই অবসাদে খালি ঝিমোয় বাদশা।

উটের সহিস গণেশের সুদিন এসেছে। এই ধূ-ধূ তপ্ত রুক্ষতার মধ্যে কোন্ নাড়ীর টান অনুভব করছে উটগুলো। ধুলো-ওড়া বান্‌ঝাটিয়ার রাস্তা ধরে চলতে চলতে নাক তুলে তারা রুক্ষ বাতাস আর ধুলোর মনোরম স্বাদ শোঁকে। তারপর পাতা ভেঙে ভেঙে খায়। নিচের ঠোঁটের কুশ্রী খাঁজগুলো এমন ক'রে নড়ে, যে মনে হয়, তারা বিড়বিড় ক'রে মন্তর পড়ছে।

বিকেলের থেকে পর পর দুটো শো চলে। 'লস্' তুলতে বদ্ধ-পরিকর গোপী। মানুষগুলি এই আগুন আর তাপে অবসন্ন। রাউটি ছাড়া কাউকে বাইরে দেখা যায় না। যে যার তাঁবুতে পড়ে থাকে।

প্রেমতারার কাছে যেন এই তাপ আর রুক্ষতাও ভাল লাগে। লালশাড়ীতে রঙের আগুন জ্বালিয়ে সে চলাফেরা করে ধীর ঠাটে। গোপীনাথ বলে,—তোমার পায়ে তাপ লাগে না তারা?

—না, মাস্টার।

গোপীর মনে হয়, নিজের সুখ যেন বেড়া হয়ে ঘিরে রেখেছে প্রেমতারাকে। সুস্থির বলা-চলা, কথা-হাসি দেখে-দেখে গা জ্বলে যায় গোপীনাথের। মনে হয় যদি ঐ মুখের হাসি বন্ধ করে দেওয়া যেতো! আর যার গরবে গরব, সেই মনোহরকে যদি দুমড়ে মুচড়ে দেওয়া যেতো!

যারা তার লক্ষ্মী, সেই আর্টিস্টদের সম্পর্কে এমন ভাবনা ভাবতে নেই। তবু গোপী ভাবে। প্রেমতারার কাছে লাঞ্ছনা পেয়েছে থেকে গোপীর চিন্তাগুলো শুধু বাঁকা-পথে ঘোরে। প্রেমতারা যেন তাকে আর মানে না। কেন? সে গোপীনাথের সেই একটা মুহূর্তের কথা জানে ব'লে? হ্যাঁ। হয়েছিলো বটে অ্যাক্সিডেণ্ট। সেইদিন ট্রাপিজকুঈন জুয়েল সেজেছিলো যেন আশমানের পরী। উল্টো দোলনায় ঝুলছিলো গোপীনাথ। জুয়েল হেসে-হেসে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো শূন্যে আর গোপীনাথ ধরছিলো তাকে। ফুলের তোড়ার মতোই সুন্দরী জুয়েলকে অবহেলে ছুড়ে দিচ্ছিলো তার নিজের দোলনায়। আর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলো প্রেমতারা। তখন সবে কিশোরী। ওদিকে ব্যাণ্ড-মাস্টার ড্যানিয়েল সবুজ-সোনালী ইউনিফর্ম প'রে সেদিন বাজনা তুলেছিলো—হি ইজ্ এ জলি গুড্ ফেলো। শুনছিলো আর হাসছিলো জুয়েল। সেই হাসি দেখে গোপীর মনটা পুড়ছিলো। অথচ পালটা হেসে তাকে-ও ছুড়ে দিতে হচ্ছিল জুয়েলকে। জুয়েল গোপীনাথের কাছে যখন আসছিলো তখন কি বলছিলো গোপীনাথ?

—জুয়েল, তুমি কুকুরের মতো নীচ!

—তুমি প্রমাণ করতে পারবেনা।

—ভেবেছ আমি জানিনা কালকে রাতের কথা ?

—তুমি প্রমাণ করতে পারবেনা।

সেই তাচ্ছিল্যের হাসি। গোপীনাথকে কাপুরুষ জেনে কি-যে তাচ্ছিল্য আর অবহেলা করে গিয়েছে জুয়েল! সেদিনই যে কেন খুন চাপলো মাথায়। ট্রাপিজ-খেলায় আর্টিস্টের যে অঙ্কের জ্ঞান থাকা দরকার তা কি ছিলোনা গোপীর ? ছিলো তো। কখন ধরতে হবে, কখন ছাড়তে হবে পাল্টা আর্টিস্টকে, কতটুকু ঝুঁকি নেওয়া চলে, কতটুকু বেপরোয়া হ'লে চলে সবই আর্টিস্টের গণনার মধ্যে থাকা চাই। গোপীরও ছিলো। সবই জানতো সে। তাই জুয়েলের মুখের সেই বাঁকা-হাসি যখন মাথায় আগুন ধরালো, তখন গোপীনাথ ইচ্ছে ক'রে বেপরোয়া হলো। জুয়েলের মাথাতেও বুঝি নেশা চেপেছিলো। বিভোর হয়ে ছিলো জুয়েল। তাই গোপীনাথ কি করলো না-করলো জানলোনা মানুষ। তারা শুধু দেখলো যে দুর্ঘটনা হলো।

কিন্তু প্রেমতারার চোখ এড়ানো সম্ভব নয়। একমুহূর্তের ব্যাপার। সে কিন্তু ঠিক-ই দেখেছিলো। সেই হাতিয়ারেই কাবু হয়েছে গোপীনাথ। নইলে সে দেখিয়ে দিতো।

গোপীর তাঁবু থেকে বান্‌ঝাটিয়ার রাস্তাটা চোখে পড়ে। 'সাঁঝের তারা' আর 'পথিক বঁধু' লেখা বাস দুখানা কাশিমবাজারের যাত্রী নিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে যায়। শিরীষগাছের তলায় সাঁওতালদের ঘরকন্না চোখে পড়ে। কার মাউথ-অর্গ্যান নিয়ে বাজাচ্ছে যেন হারাণ। ঝাড়া দিয়ে উঠেছে ছেলেটা। শিউলীর সঙ্গে ভাব হয়েছে খুব। গোপীনাথ ভাবে যদি প্রেমতারাকে বাগ মানানো যেতো। ঐ ফাঁপানো খোঁপা-সুদ্ধ তেজী ঘাড় যদি লুটিয়ে ফেলতে পারতো পায়ে। তবে যেন শান্তি হতো গোপীনাথের। ঐরকম মানুষ গোপীনাথ। মনে তার ঘোলা জলের পাক।

গরম নামলো সমারোহ ক'রে। স্টেশান-পারের গড়ের মাঠ জ্বলে গেল। গঙ্গার জল নেমে একহাঁটু হয়েছে। আমের মুকুল খ'সে পড়লো। গাছের পাতা জ্বলে গেল। সামনে চড়ক। গাজনের ধুম লেগেছে। কাপড় ছুপিয়ে সন্নেসী হয়েছে কতজন। আকাশের দিকে চাইলে চোখ জ্বলে যায়। মনে হয়, সেখানেও বোধহয় গৈরিকধারী কোনো সন্ন্যাসী কুণ্ডে অগ্নিসঞ্চার ক'রে হোমে বসে আছে। গোরাবাজারের রাস্তায় যেতে আরেকখানা মাঠ পেরুতে হয়। ওপারে কলেজের ঘাটে শিবতলা। এই এতখানি মাঠ পেরিয়ে নীলের উপোস ক'রে কেমন ক'রে মানুষ যাবে ডালা নিয়ে, ভেবে পায়না মনোহর।

সংক্রান্তির দিনটা সুরু হলো। ভোর নয়, যেন ভরা-দুপুর। সকালবেলাই এমন ঝাঁজ দেখা গেল আকাশে। একা শশী নয়, মনোহর বিমল সব ক'জনা ছেলের কল্যাণে উপোস করেছে মাসী। এই তাতে সারাটা দিন উপোসী রইতে হবে বলে ভোরবেলাই একটু আরক সেবা হয়েছে মনে হলো। লাল চোখ। বুঁদ হয়ে ব'সে আছে। স্বগতোক্তির মতো মনোহরকে বললো—

—ছোটবেলা দল বেঁধে মাথায় ডালা নিয়ে বেরিইছি—জল ডেকে ডেকে, জোড়া বলি পড়েছে থানে, তবে গে' জল নেমেছে।

তারপর বললো,—ক্ষেপে যাবে জানোয়ার। মারতে হবে গুলি ক'রে। দেখবি মজা সাঁজের বেলা। সাঁজের ট্রিপে খেলা হ'লে হয়!

তারপর মাঠের দিকে চেয়ে বললো,—খালি শকুন উড়ছে। পাখ-পক্ষী মরছেও যেমন! বাঁদরগুলো অবধি মরে পড়ে যাচ্ছে গাছ থেকে। তুই বলিস কি রে মনোহর, এ যে মস্তো দুর্লক্ষণ। ক হয় না-হয় দেখিস!

পরে মনোহরের মনে হয়েছে, ঠিক চড়কপুজোর দিনেই বা মাসী অমন কথা বললো-কেন? মাসী কি ভবিষ্যৎ দেখতে পায়?

বেলা যেমন বাড়তে সুরু করলো, সুরু হলো ঢাকের বাজনা।

এই চড়কপুজোর কথা মনে ক'রে যতো কামার কুমোর যুগী ছেলের দল শিবের দেয়াশ্নি হয়েছে তারা ঢাকঢোল বাজিয়ে বেরুলো। বড় জাগ্রত দেবতা এই পাঁচতলার শিব। দলে দলে চললো এই এক-মাসের সন্ন্যাসীরা। বোল তুললো—'বাবা পঞ্চেশ্বরের চরণে সেবা লাগে—মহাদেব!'

ধোপাপাড়ার ছেলেরা এলো ঢাকঢোল কাঁসি নিয়ে। প্রতি-বছরের মতো এবারও গিরিধোপানীর 'ভর' হয়েছে। বুক দিয়ে দণ্ডী কাটছে সে এই ধুলোর ওপরেই। মাটিতে প'ড়ে লম্বা হয়ে প্রণিপাত করছে আর তার হাতের ডগায় আমের ডাল ছুঁইয়ে দিচ্ছে মেয়ে-বৌ।

এইসব ঢাক-ঢোল-কাঁসির শব্দ শুনতে শুনতে খাঁচায় বাদশা চম্‌কে উঠলো। দুরন্ত গরম। তাতে এইরকম শব্দের আঘাত। এই সব-কিছু থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু সামনে পেছনে মোটা শিকের আড়াল। চাইলেও উপায় নেই। থাবা দিয়ে অক্ষম রোষে শিকে বাড়ি মেরে থাবায় মুখ গুঁজে বসে রইলো বাদশা। আফিমের নেশা আর চাবুকের ভয় কাটিয়ে মানুষের ওপর একটা দুর্জয় ঘৃণা তার চোখে জেগে উঠলো। পারলে, মানুষকে একঝট্‌কায় ফেলে দিয়ে সে পালাতো জঙ্গলে। আর এই দুরন্ত গরম। খাঁচাটার ছাদ, শিক, মেঝে সবই হয়েছে আগুনের মতো। নির্জীব হয়ে পড়ে প্রায় ধুঁকতে চাইলো বাদশা। জলের পাত্রটা হাতে নিয়ে কখন আসবে মনোহর? সেইদিকে চেয়ে রইলো সে। আর, প্রত্যেকেই আজকের দিনটার দ্রুত অবসান চাইছে জেনে সূর্যটা এতটুকু ব্যস্ত না হ'য়ে একটু একটু করে পশ্চিমে হেলতে লাগলো।

এমন গরম। কিন্তু প্রেমতারার তাঁবু যেন এক মধুকুঞ্জ। মাসীর প্রসাদ পেয়ে এসেছে মনোহর। দিন-দুপুরে নেশা ক'রে মাস্টারের ক'রে ভয় হলো। ভাবলো, ঘুমিয়ে নিই দুপুর-ভোর। কেটে যাবে।

সন্ধ্যায় খেলা রয়েছে। ভাবলো, প্রেমতারা যদি গালাগালি করে, তো বলবে,—প্রিবিত্তির গোলাম আমি, তারা। মার্, মাথায় মার্ এক বাড়ি। শিক্ষা হয়ে যাক, হ্যাঁ।

তেমন ঠ্যাকে তো গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে নেবে এখন।

কিন্তু তাঁবুতে ঢুকে ছাখে আগুন লেগেছে। জাফরানী শাড়ী প'রে মাথার চুল এলো ক'রে পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে ঘুমুচ্ছে প্রেমতারা। রঙে, কাপড়ের রঙে, রোদের আঁচে—সব মিলিয়ে যেন আগুন জ্বলেছে। দেখে সব সঙ্কল্প ভেসে গেল মনোহরের।

ছুরন্ত ডাক যৌবনের। ছু'জনে নিমেষে ভুললো সব। সত্যি হয়ে রইলো শুধু একটা তৃষ্ণা। যার নিবৃত্তি নেই। মনোহরের মনে হলো—রক্তমাংসে প্রেমতারা যতদিন ঘুরে বেড়াবে, ততদিন তার তেষ্টা মিটবেনা। তাই রেণু-রেণু করে প্রেমতারাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে নিতে চাইলো। আবার অবাক হ'য়ে তাকালো। প্রেমতারা কি জাছু জানে? এই, যে ঝড়টা তুলেছিলো মনোহর, তার সবটুকু ঝাপটা বুকে নিয়ে তবু ছাখো কেমন হাসিমুখে চেয়ে আছে। প্রেমতারার ঐ বুকে মুখ গুঁজে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুম গেল মনোহর।

তৃষ্ণার্ত বাদশার করুণ আর দীর্ঘ চীৎকার তাই মনোহরের কানে গেলনা।

সন্ধ্যাবেলা ঠিক-ই জমে উঠলো সার্কাস। শিবতলায় পুজো দিয়ে গঙ্গা নেয়ে চড়কের মেলা দেখতে এসেছিলো যে-সব গোলা-মানুষ, তাদের ভিড়েই ভ'রে গেল তাঁবু। ঝম্‌ঝম্ করে বেজে উঠলো বাজনা। শহরে মিস্ মাধুরী আর খুরশীদের 'সাদী' সিনেমা চলেছে। তার যে গান মুখে মুখে ফিরছে সেই 'য়ে দিল কঁহা লে জাউ—য়ে কৌন্ ঠিকানা হ্যায়' বেজে উঠলো ব্যাণ্ডে। খুশী হলো দর্শকজন, আর ভিড় দেখে খুশী হলো গোপীনাথ।

বাদশার খাঁচা গড়গড়িয়ে আনতে আনতে দশ-পনেরোটা খেলা হয়ে গেলো। বারের খেলা দেখিয়ে সাদা-টাইট-পরা ছেলেরা চলে গেলো। একদল মেয়ে নিয়ে বৌ-এর দিকে চোখ মট্‌কে হাসতে হাসতে শশী এসে একচাকার সাইকেলে খেলা দেখালো। চামেলী আবার একলা ক'রে এলো ভালুকের সঙ্গে সাইকেল চড়তে। এর সঙ্গে একবার আর ওর সঙ্গে একবার প্রেম ক'রে সারাটা দিন ঝগড়া বাধিয়ে রেখেছে সুখেন বক্সী টিয়া-চন্দনা ছুই বোনের মধ্যে। চায়ে চনির ভাগ নিয়ে হারাণের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা যখন মরণ-গ্লোবের পাশে টুক্‌টুকে লাল টিউনিক প'রে এলো সুখেন, তখন আর রাগ মনে রইলোনা কারু। কি টিয়া, কি চন্দনা ছু'জনেই চোখে চোখে হাসলো। চমৎকার কৌশলে দর্শকদের বুকে ভয়ের ছুরুছুরু তুলে মরণ-গ্লোবের ভেতরে খেলা দেখালো সুখেন। দড়ির খেলা শিখে এসেছে বাঁশী। হাতের কায়দায় দড়িতে কতরকম প্যাঁচ আর কত কস্‌রৎ খেলালো! দেখিয়ে মাৎ করে দিলো সকলকে। ময়নাকে মাঝে রেখে দড়ির প্যাঁচে মেয়েটাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধলো। আবার খুলে নিলো হাতের কায়দায়। দড়ির ঘা-এ যা লাগলো, গায়ে মাখলোনা ময়না। কেননা জানে যে, সময় পেলে ঐ বাঁশী-ই তাকে হাত বুলিয়ে আদর করে যাবে। বাঁশীর মাইনেটা বাড়লে ঐ প্রেমতারা-দিদির মতো ঘর বাঁধবে ময়না। শিউলী আর রতিলালের জুড়ি এলো ড্যাগার-থ্রো দেখাতে। হারাণের সঙ্গে ভাব হয়েছে শিউলীর। হারাণের ষোলো আর শিউলীর তেরো বছর বয়েস। ছ'মাস আগেকার ভীতু আর নিশ্চুপ মেয়েটাকে যেন চিনতে ভুল হয়ে যায়। হারাণের মারফত একটু মাছ-ছুধের যোগান বেশি পেয়ে শিউলীর যেন রূপ খুলতে সুরু করছে। হারাণ অনেক স্বপ্ন ছাখে। কিন্তু সার্কাসের মানুষের বুঝতে বাকি নেই শিউলীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সেই সুখের দিনে শিউলী রান্নাঘরের চাকর ঐ হারাণকে মনে রাখবে ; কখনো-ই না। যদি বাঁচে তো একটা ছুরির মতো মেয়ে হবে

শিউলী। এর মধ্যেই শিউলীর খেলায় কেমন কায়দা এসেছে। রতিলালের ছোরাগুলো বুক-হাতের পাশ দিয়ে অনুভব করতে ভয় পায়না সে। আবার কেমন হেসে নিচু হয়ে 'বো' ক'রে বেরিয়ে আসে।

সমস্ত দিনের দাবদাহটা যেন গায়ে লাগেনি, এমনই ভঙ্গী ক'রে ঢোকে প্রেমতারা। হ্যাঁ, লেগেছে বটে গরম। তবে কথা হয়ে আছে, রাতের বেলা সে আর মনোহর নাইতে যাবে লালদীঘিতে। কালো গভীর জল। ভয় পাবেনা প্রেমতারা। শরীর জুড়োতে হ'লে ঐ কালো জলে গা ভাসাতে হবে। চামেলী, কিরণ এরাও যাবে। কারুকে জানানো হবেনা। রাতের বেলা চুরি করে প্রেমতারার তাঁবুতে সিদ্ধির মালাই খাওয়া হবে।

এরিনাতে তাই নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে ঢুকলো প্রেমতারা। রং ফেটে পড়ছে। নতুন জরির টিউনিক পরা হয়েছে। চুলে জরির প্রজাপতি বসে আছে। দর্শকের মন হ'রে গেলো। হাতে হাতে ধ'রে মনোহর আর প্রেমতারা অভিবাদন জানালো দর্শকজনকে।

মনোহর বাদশার মস্ত ভরসাস্থল। বলতে কি, মনোহরের দিকে চেয়ে-চেয়ে বাঁচে বাদশা। আজকে সে-চাউনিতে আগুন আছে নজরে পড়লোনা মনোহরের। আপ-ডাউন। জাম্প, বাদশা জাম্প। আগুনের রিং দেখে মোটে ঝাঁপ নিতে চায়না বাদশা। সমানে ঘাড় নাড়ে আর ঘড়ঘড় করে। এদিকে আগুনের রিং। আর ওদিকে লিভিং-ফাউন্টেন বিমলের জন্যে বালতি বালতি জল আসছে। লাল-রঙের বালতিতে তেলের-গন্ধ-ধরা জল। তবু সে জলের ছলাং-ছলাৎ শব্দ কানে যাচ্ছে বাদশার। সেদিকেই ঘুরতে চাইছে। প্রমাদ গণে মনোহর। এরিনায় বুঝি ইজ্জৎ যায়। আষ্টেপিষ্টে শেকল-বাঁধা বাঘ নয়। মনোহরের জেদে এরিনায় বাদশা শেকল-ছাড়া থাকে। খাঁচা থাকে দূরে। হাতে ইলেক্‌ট্রিক চাবুক-ও রাখেনা মনোহর। সাধারণ চাবুক। আর চাবুকের শরণ নিতে হবে? কোথায় যেন লাগে। মনোহরের মনে হয় বাদশা যেন বিশ্বাসঘাতকতা করছে আজ।

জল ঢালছে বালতিতে বিমল। আবার জল বুঝি ফেলে দিচ্ছে ধুলোমাটিতে। হাজার হলেও জল খাবে তো বটে বিমল? তাই পরিষ্কার জল চাই। এত জলের অপচয়? বাদশার গলা থেকে বুক অবধি একফোঁটা জলের জন্যে শুকিয়ে ওঠে। জলের শব্দ শুনে-শুনে তৃষ্ণার্ত বাদশা আগুনের রিং থেকে পিছিয়ে আসে। মনোহর বাধ্য হয়ে চাবুক মারে।

চাবুক পড়তে বাদশা ক্রুদ্ধ গর্জন করে। লাফিয়ে যায় আগুনের রিং। বার বার তিনবারই। বলতে হয় না। কিন্তু মানুষের ওপর যে জন্মগত অবিশ্বাস ও ক্রোধ—মনোহরের যত্ন আর আফিমের নেশা দিয়ে চেপে রেখেছিল বাদশা, আজ সেই ক্রোধ বাদশার চেতনায় ফুলতে ফুঁসতে থাকে। এবার বাদশার মুখে মাথা দেবার জন্যে এগিয়ে আসে প্রেমতারা। বিরাট একটা হাঁ। সোনালী চুলে রিবন-বাঁধা মাথাটা ঢুকিয়ে নিশ্চল থাকে প্রেমতারা। আর সেই সময়ই ঘটে যায় সর্বনাশ।

—প্রেমতারা।

ব'লে প্রেমতারার মাথাটা ঝট্‌কে সরিয়ে নিয়ে তাকে ঠেলা দিয়ে ফেলে দেয় মনোহর। বাদশা গর্জন ক'রে এরিনার এন্‌ট্রান্সের দিকে যেতে চায়। ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে প্রেমতারা। বাদশা যে এরিনা ছেড়ে জলের দিকে যেতে চাইছে তা বোঝেনা মনোহর। ভয়ে বুদ্ধি হারিয়ে চাবুক মারে বাদশার পিঠে পায়ে, যেখানে পারে। আর গর্জন ক'রে ফিরে বাদশা পড়ে মনোহরের ওপর। দুই থাবার ঘায়ে মনোহরকে ফেলে দিয়ে কামড়ে ধরে ডানহাতটা। গোপীনাথ ইলেক্‌ট্রিক চাবুক নিয়ে ছুটে আসে। দর্শকজন কতজন পালায়, কতজন বা ভিড়ের মধ্যে পড়ে যায়। মনোহরকে ফেলে লাফিয়ে বাদশা যখন এরিনার দরজায় পড়ে, তখন পালিয়েছে সেখানকার মানুষজন। মাটিতে জল পড়ছে কাৎ বালতিটা থেকে। সেই জল-ই খেতে সুরু করে বাদশা।

মনোহরের রক্তাক্ত মুখখানা দেখে প্রেমতারার গলা বন্ধ হয়ে যায়। বলে,—মনোহর! মনোহর!

মুখ তুলতেই চোখে পড়ে গোপীনাথের চোখ। তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে চোখে অচঞ্চল দৃষ্টি আর অদ্ভুত কোন্ জিঘাংসা দেখে প্রেমতারা ভয়ে কাঠ হয়ে যায়।

একটা মিনিট নয়। একটা মুহূর্তও নয়। তার চেয়েও খণ্ড-বিখণ্ড কোনো সময়—একরতি কাল দু'জনে দু'জনকে ছাখে। আর পরম তৃপ্তিতে জল খায় বাদশা। বাদশা আছে আর তার তৃষ্ণার পানীয় আছে। মাঝামাঝি কোনও মানুষ নেই। তৃপ্তিতে ছোট ছোট শব্দ বেরোয় বাদশার গলা থেকে।

সেই শব্দটা শোনা যায় শুধু। আর কিছু শুনতে পায়না প্রেমতারা।

॥ ১০ ॥

যে বাদশা ছিলো মনোহরের প্রাণ, সেই বাদশা-ই ফিরে ঘা দিলো মনোহরকে। ফুরিয়ে গেল দু'দিনের মনসবদারী। ফিরে আবার নফর হবে কি না, সে-ও গোপীনাথের দয়ার ওপর নির্ভর। সরকারী হাঁসপাতালের বিছানায় লাশ হয়ে পড়ে রইলো মনোহর কতদিন ধ'রে। পচে উঠলো ঘা। বিষিয়ে গেল মুখ। ডানহাত খানার কাজ চিরতরে খতম হয়ে গেল। খসেই পড়ে যায়নি। নইলে এই ডানহাতখানি দিয়ে কোনদিন-ও মনোহর মুঠো করে ধরতে পারবেনা চাবুক। জঙ্গীর পিঠে তুলে নিতে পারবেনা প্রেমতারার দেহখানি। বাদশার তীক্ষ্ণ নখে মুখখানিও ক্ষতবিক্ষত। এ মুখ যে সেই মুখ, চিনতে দেরী হয় বন্ধুজনের। প্রথম দিন আয়না দেখে আয়নাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো মনোহর। আর হাঁসপাতালের পালিশ মেঝেতে সেই আয়না ভেঙে শতচূর্ণ হয়েছিলো।

প্রেমতারা মনোহরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে হাঁসপাতালের ডাক্তারের হাতে পায়ে মাপ চেয়েছিলো। ডাক্তার বলেছিলেন—এই বেয়াড়া রুগী বাবু রাখা চলবেনা হাঁসপাতালে। নিয়ে যাও।

বোকার মতো অবুঝ ক্ষোভে মনোহর বলেছিলো—এ আপনি কি করলেন ডাক্তারবাবু? মুখ আমার এমনিধারা খুঁতো হয়েই রইবে? আমি তা হ'লে বাঁচব কেমন করে গো? এ মুখ বের করবো কেমন ক'রে?

গোল করোনা, গোল করোনা,—ব'লে ধমকে গিয়েছিলো জমাদার। বিকেলে নার্স ডিউটিতে এলে পরে মনোহর বলেছিলো—আপনি দিদি ডাক্তারবাবুকে বলে কয়ে ভালো মলম একটা এনে দিন আমাকে। ঝাতে এই দাগগুলো মিলিয়ে যায়। ওই প্রেমতারা আপনাকে পয়সা এনে দেবেখ'ন। আপনার পায়ে ধরি, দিদি!

নার্স বিব্রত হয়ে পড়েছিলো। বলেছিলো—হাঁসপাতালের ওষুধে পয়সা লাগেনা। ও দাগ তোমার যাবেখ'ন। ধীরে আস্তে চলে যাবে।

—ব্যাটাছেলে ত! কন্দর্পোকান্তি দিয়ে করবে কি?—নিষ্ঠুর বিদ্রূপে বলেছিলেন ড্রেসার।

তখন মনোহর বিশ্রীভাবে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলো—আমি যে সার্কাসে খেলাই গো! খেলাবো কেমন করে এই পোড়ামুখ নে'? আমার সর্বনাশ হয়ে গেল!

যে মানুষটার বাঁচবারই কথা নয়, তাকে বাঁচালো ডাক্তার। কিন্তু কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠার বদলে সেই মানুষই যখন উল্‌টে দোষী করে তাকে, তখন নেমকহারামী দেখে না চটে পারে না ডাক্তার। রাগ করে মনোহর ওষুধ খায়নি দেখে তার আরো রাগ হয়। সরকারী হাঁসপাতালে কড়াকড়িতে যাকে কাজ করতে হয়, সেই-ই বোঝে কি মূল্যবান্ এই ওষুধপত্র। সব আন্তরিকতার দিকে চোখ বুজে কানার মতো মনোহর যে নিজের ক্ষতিটাই বড় করে দেখে, তাতে ডাক্তার

আরো চটে। মনোহরকে খালাস করে নিতে এসে প্রেমতারা যখন বলতে যায়—আপনি ঝা করলেন ডাক্তারবাবু, কোনদিনও ভুলব নাকো। ডাক্তার তখন খিঁচিয়ে ওঠে—ঝামেলা করো না বাবু কাজের সময়, বলে দিলাম, হ্যাঁ।

ঘরে ফিরতে প্রেমতারা প্রথমটায় বুকে ঘা পেলেও ভরসায় বুক বেঁধেছিলো। যে হ্যাঁ, এমনটি কি রইবে? সারবে নিশ্চয়। মলম এনেছিলো পয়সা খরচ করে। মনোহরও সেই বিশ্বাসে খুব সচেষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু এ ক্ষত যে সারবার নয়, তা বুঝতে দেরী হলো না তার। একদিন সেই মানা করলো। বললো—কি হবে তারা? কষ্টের পয়সাগুলো জলে দিচ্ছিস্? তার চে' তুই মালিশের মলম নে' আয়। ডান হাতখানা সারাই। চিরকাল তো বসে খাব না, বল?

—কেন, আমার পয়সা খেতে তোমার অপমান হলো?

—না তারা। মাথা নাড়লো মনোহর। বললো—দেরী হ'লে এ হাতটা যদি প'ড়ো হয়েই থাকে, তবে আমার কি হবে বল?

মলম এনেছিলো বটে প্রেমতারা। তবে দুপুরে খালি এরিনার গ্যালারীতে বসে চোখের জল ফেলে হালকা করে নিলো। মনোহর ভয়ে কানা হয়েছে। ও হাত আর কোনদিন উঠবে?

এখন বাঘের খেলা দেখায় গোপীনাথ। পাশার দান উল্টে গিয়েছে, আর মনোহরকে নিঃশেষ করে লুটেপুটে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছে গোপীনাথ।

নিজের কপাল দেখে বিস্ময়ের অবধি নেই গোপীর। নিজেকেই ভালবেসে ফেলেছে সে। মনোহর অকেজো হলো এরিনায়। এখন তাকে ছাড়িয়েও তো দিতে পারতো সে? দিলো না। চালে ভুল করে কোন্ মূর্খ? মনোহরকে গোপী এখন দয়ালু মনিবের মতো বলে—যা হলো তা হলো মনোহর। সেই ছেঁড়া কথা নিয়ে পড়ে রইলে পুরুষমানুষের চলে?

মনোহরের জীবনমরণ গোপীর হাতে। তাই গোপীর কথাগুলি

শোনবার জন্যে হাঁ করে থাকে মনোহর। বুকের ভেতর কল্‌জেটা ধুক্‌পুক্‌ করে। প্রাণটা যেন টক্‌টক্‌ ক'রে নড়ে। শার্টের কলার তুলে দিয়ে নিচু হয়ে চেয়ারটার পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে মনোহর।

গোপীর বড় আনন্দ হয়। চোখ পিটপিট ক'রে উরুর ঘামাচি টিপে সে বলে,—মাস্টার চামার নয় জানলে মনোহর? সার্কাসের মানুষ-গুলোকে গোপীমাস্টার আপনার জন বলে জানে। তার প্রতিদান অ.বশ্যি পাই না আমি। আমার দোষক্রুটি কি তোমরা ক্ষমাঘেন্না করে নাও? না তো! যাক্‌গে। সে-কথা ভাবলে আমার চলে না। আমি তোমায় ফেলব না। যেমন দেখাশোনা করছিলে তেমনই দেখো বাঘটাকে। ও জানোয়ার তোমার হাতপোষা হয়ে রয়েছে যেকালে! আর···

একটি ক'রে কথার শেষে এত উত্তেজনা সৃষ্টি করে কেন গোপীনাথ? মনোহর তাকিয়ে থাকে। গোপী বলে,—আর চাও তো ক্লাউনের কায়দা-কসরৎ দুটো শিখে নাও। সুকুলবাবু তো এলো বলে। চিঠি দিয়েছে।

হাসতে থাকে গোপীনাথ। জীবনটাই তো একটা মস্তবড় খেলা। সেইভাবেই দেখুক না কেন মনোহর। হাসুক না কেন! কাল ছিলে লায়ন-টেমার! কাল তোমার দিন ছিলো। আজ তোমার দিন নেই। আজ নয় তুমি ক্লাউন হলে? তুমিও হাসো! কেন, বিলিতী ছবিতে সব ঘাড়মোটা জনি-দের দেখনি? মুখের ওপর ঘুসি পড়লো। মুখ ফেটে রক্ত বেরুলো। সেই মুখ মুছে জনি চললো দুনিয়ায়।

মনোহর কেন সেইভাবে হাসতে পারছে না? গোপী বলে,—আর কি জানো মনোহর? অনেক ভেবে দেখেছি আমি, ক্লাউনের সে মান্ধাতার আমলের ভাঁড়ামী আর পছন্দ করে না পাবলিক। বেশ নতুন খেলা কিছু বানাতে পারো?

কোটটা তুলে নিয়ে ডান কাঁধটা চাপা দেয় মনোহর। ডান হাতটা ঢাকে। নিরুত্তরে বেরিয়ে আসে তাঁবু থেকে।

আজ কতদিন হয়ে গিয়েছে বাদশার খাঁচার সামনে যায়নি মনোহর। বাদশাও না জানি কত দুঃখ পেয়েছে? নিজের মতোই ভাবে মনোহর। তাকে মিছিমিছি খুঁতো ক'রে দিয়ে বাদশারও দুঃখ হয়েছে, এ কথা ভাবতে ভালো লাগে তার।

খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে মনোহর কিছুক্ষণ কথা কয় না। ঈষৎ হেলে কেমন শুয়ে আছে বাদশা। সাদা পেটটা কেমন ওঠানামা করছে। নিঃশ্বাস পড়তে যেন হাড় দেখা যাচ্ছে পাঁজরের। জলের পাত্রে ময়লা জল। খাঁচায় দুর্গন্ধ। মাছি ভন্‌ভন্ করছে। গলা পরিষ্কার করে নিচু সুরে ডাকে মনোহর,—বাদশা! বাদশা! বাদশা!

প্রথমে তাকায়। হালকা সবুজ আর অবিশ্বাসী চোখ। অভ্যেস-মতো ডান হাতটা বাড়াতে গিয়ে ব্যথা পায় মনোহর। বাঁ হাতখানা দেয় খাঁচার ফাঁকে। বাদশা এবার উঠে আসে। চাটতে থাকে। প্রথমে অল্প। তার পর জোরে। বাদশার কপালে হাত থাবড়ে দেয় মনোহর। আস্তে আস্তে বলে,—যা হয়েছে, চুকেবুকে গেছে, আমার মনে নেই কো।

মনোহরের ক্ষমা সে যে পাবেই, তা যেন জানতো বাদশা। এবার বাদশা এত কাছে আসে যে, তার দুর্গন্ধ গরম নিঃশ্বাস মনোহরের মুখে লাগে। গলাটা নামিয়ে মাথাটা খাঁচার গায়ে ঘষে বাদশা। যেন বলতে চায়—তুমি এতদিন আসোনি কেন? তুমি এতদিন আসোনি কেন?

এক হাতে জল টেনে টেনে আনে মনোহর। জলের বালতি এনে এনে কাঠের জালা ভরে। বাদশা যেন বুঝতে পারে এবার স্নান হবে। খুব আনন্দ হয়। কান খাড়াখাড়া করে ত্থাখে কি হচ্ছে। আগের মতো যে কাজ করতে করতে মনোহর আনন্দে গান করছে না, শীস দিচ্ছে না, ছুটে ছুটে যাওয়া-আসা করছে না, অত কথা জানে না বাদশা। মনোহর হোস-পাইপ দিয়ে বাদশার খাঁচার জলের ধারা দেয়। পরিষ্কার হয়ে যায় এতদিনের জমা ময়লা। বাদশা

জলের ফোঁটাগুলো গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে। জলখাবার কাঠের পাত্রটাও ভরে দেয় মনোহর।

রান্না সেরে নাওয়ার আগে, প'ড়ো হাতখানায় কবিরাজি তেল মালিশ করবে বলে মনোহরকে খুঁজছিলো প্রেমতারা। ভেজা গায়ে ঢুকতে দেখে গা তার জ্বলে যায়। বলে,—ফের ঐ অকাজ করতে গেছ তুমি ?

মনোহর জবাব দেয় না। জামাটা খুলে ফেলে আয়নাখানা নিয়ে নিজের মুখখানা ছাখে। রাগে কান্না আসে প্রেমতারার। ফেলে দেয় আয়না। মনোহর বলে,—এই দেখ পাগল! আয়নার ওপর চটলি কেন ? নিতুষী আয়না। কী দোষে তুষী বল ?

—আয়না দেখতে হবে না তোমার।

—তোকে তো দেখতে হবে ? মিছেই এমন বাহারের আয়নাখানা ভাঙলি। জানলি ? আবার আর একখানা খরিদ করে নে' আসবো অখন।

তারপর গুন্‌গুনিয়ে গান গায় মনোহর। একটু একটু হাসে। বলে,—এই মুখের দৌলতে আমায় নতুন চাকরি দিচ্ছে মাস্টার। জানলি ?

—সে আবার কি!

—বলছে ক্লাউনের কাজ শিখতে। বুড়ো সুকুলবাবু আসছে ফিরে। কায়দা রীতিগুলো শিখে নিই! তারপর ও-বুড়োকে নির্ঘাত তাড়াবে গোপীনাথ। আমার চাকরি তখন বাঁধা হবে, না কি বলিস ?

—মাস্টার তোমায় বললে এ কথা ?

প্রেমতারা যেন মাস্টারের ঔদ্ধত্যের কূলকিনারা পায় না।

মনোহর বলে,—অমন ফোঁস করিস কেন ? বুঝে ছাখনা কেন ? যে মাস্টার কাজ দিয়ে বাঁচাল আমায়। নয়তো আমাকে তো তাড়িয়ে দিতেও পারতো ?

চটপট চুল বাঁধে প্রেমতারা। জড়িয়ে নেয় খোঁপা। মনোহর

হাত চেপে ধরে। বলে,—অমনি চললি ফয়সালা করতে? বড় তেজ তোর। শোন্!

মনোহরের বাঁ হাতখানায় আজও বেশ জোর। প্রেমতারা দাঁড়িয়ে যায়। মনোহর গলা নিচু করে বলে,—অমন অবুঝের মতো করিসনি! শোন্ আমার এখন কোনো দাম নেই, তারা! তবু এখানে মাস্টার রইতে দিলো তোর খাতিরে। তোর তো দাম আছে? মিছে ঝগড়া করবি কেন?

এবার প্রেমতারার নীল চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে। নাক টেনে সামলে নেয় প্রেমতারা। বলে,—তাই বলে এরিনায় ক্লাউন হয়ে থাকবে? আমার সইবে কেমন ক'রে?

—কেন, আগে সইতো না? তোর মনে নেই?

—আগের কথা আমার মনে নেই।

জীবনের সঙ্গে মনোহরের যে বাঁধনগুলোর বাঁধা ছিলো, সবই যেন জট পাকিয়ে গিয়েছে। স্নেহ, প্রেম, ক্ষিদে, তেষ্টা, ভয়-ভীতি সবই শরীর দিয়ে অনুভব ক'রে বাঁচতো মনোহর। তুনিয়াতে চলাফেরা করবার মূলধন ছিলো এক সুস্থ নিটোল শরীর। সব কেজো মানুষের মতোই মনোহরও ভাবতো, গতর রয়েছে খেটে খাব। ভাবনা কি?

কিন্তু সেই শরীর-ই তার নেই। খুঁতো শরীর। প্রেমতারাকে ভালবাসতে সুরু করে নিজেকে সাজাবার কত চেষ্টা ছিলো তার! সেজেগুজে নিজেকে দেখে নিজেই তারিফ করতো। এখন ডান হাতখানা প্রায় অবশ। ঝুলঝুল করে। মুখ, গলা, ঘাড় ক্ষত-বিক্ষত কুৎসিত। ভরসা হারিয়েছে মনোহর। তাই সে প্রেমতারাকে বোঝাতে চায়। জীবন-বিমুখ হয়ে এক রূপকথা সৃষ্টি ক'রে নিজেকে লুকোতে চায়। বলে,—নফর ছিলুম, তুই ছিলি রাণী। আবার তু'দিনের বাদশাহী খতম করে নফর হইছি। মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হবে তো? তুই মিছে তুঃখ পাসনি তারা।

সার্কাসের মানুষের এ কবিপনা সাজে কি ? প্রেমতারাও বোঝে। বোঝে যেখানে জোয়ান মানুষের মৌসুমও দু'দিনে ফুরোয়, সেখানে মনোহরের যা মিললো তা-ই ভালো মনে করা উচিত। রাগ করবার কোনো মানে হয় না। মনোহরকে খাটে বসিয়ে খুঁতো হাতে জোরে জোরে তেল মালিশ করে প্রেমতারা। বলে,—দিনে ঘণ্টা দু'য়েক করে মালিশ দিলে নির্ঘাৎ হাত ভালো হবে। বলেছে ডাক্তার।

মনোহরও বিশ্বাস করতে চায়। চোখ বুঁজে মালিশ নেয়। কথা কয়না।

প্রেমতারা পড়েছে জবর ফাঁদে। এরিনাতে পাশাপাশি, সে তো কাজের খাতিরে মুহূর্তের খেলা। গোপীনাথ তাতে মানবে কেন ?

প্রেমতারার দুর্ভাগ্যে সহানুভূতিটা তার উছলে-উছলে পড়ে। এই ছিলো তারার কপালে ? এই পঙ্গু আর প'ড়ো মানুষটা নিয়ে তাকে চলতে হবে ? এ কোন্‌দেশী অবিচার বিধাতার ?

—বুঝলে তারা, বিধেতা বেশী সুখ দেখতে পারেনা !

জবাব করেনা তারা। কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে গোপীনাথ বলে,—আর ও কি তোমার যোগ্য মানুষ ? আমি বললে তো খারাপ শোনাবে। কিন্তু বলুক না কেন আর দশজন ?

জবাব করেনা প্রেমতারা। একটু হেসে বসে থাকে। আজকাল আবার হাঁকডাক সুরু হয়েছে গোপীনাথের। প্রেমতারা এসে তাকে চা বানিয়ে দিক। এই মিষ্টি প্রেমতারার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসুক হারাণ। আজ মাংস রান্না হয়েছে মেসে। প্রেমতারা খাক্‌না কেন ভালো করে ? না খেলে হবে কেন ? শরীরটি, বুঝলে তারা, শরীরটি ভালো রাখা চাই। এই দেখনা কেন আমাকে ! ভোরবেলা দেহখানা ডলাইমলাই। তারপর যোগাসন, প্রাণায়াম। একঘটি কাঁচাদুধ। ফলের রস।

বলে আর নিসংঙ্কোচ বন্ধুত্বের ভান ক'রে গোপী বলে,—দাও, দাও দিখিনি ঐ বোতলটা থেকে ঢেলে?

ঢক ঢক করে খেয়ে নেয় গোপীনাথ। শরীরে সাতটা বাঘের মতো শক্তি, নেশা ধরেনা অত চট্ করে। তবে খেয়ে নিয়ে আরো যেন দুর্মদ হয় গোপী। গৌরবর্ণ দেহ। পেশীগুলো টানটান, পরিস্ফুট। প্রেমতারার নিজের যেন কেমন ভয় ভয় করে। ঐ মানুষটার প'রে যদি তার এতটুকু আকর্ষণ থাকতো, তবে সহনীয় হতো এই সন্ধ্যে-গুলো। সার্কাস আর্টিস্টের সন্ধ্যে মানে রাত এগারোটা। বারোটা একটা বাজলে তবে তাঁবুতে আসে প্রেমতারা।

মনোহর রেগে যায় এক এক দিন। বলে,—এত রাত অবধি মাস্টারের তাঁবুতে থাকিস কেন? অন্য মানুষরা কি বলে জানিস? হাসাহাসি করেনা?

—কে, হেসেছে কে?

—কেন ঐ শিউলী আজ হাসছিল।

—নে' যেতে হতো মাসীর কাছে। কানটি ম'লে দুই থাবড়া দিয়ে সোজা করে দিতো।

—ওঃ, সবাই ওনার বশ!

মাথায় আগুন লাগে প্রেমতারারও।

—বাজে ব'কোনি রাত ক'রে! কেন আমাকে বসে বসে শুনতে হয় মাস্টারের বক্‌বকানি তুমি জানোনা? মনে নেই, লালবাবুকে কেমন তাড়িয়ে দিলো? খেলা পড়ে গেলে কে রাখে আর্টিস্ট? বুঝে শুনে ন্যাকা সেজোনা। ভালো লাগেনা বাবু!

এবার মনোহর অভিমানী।

—ভালো লাগেনা? আমায় ভালো লাগেনা বল্?

—ন্যাকাপনা ক'রোনি! মাস্টারকে আমি চিনিনা? ওর মকরের দাঁত। পা-টি কেটে নেবে জলের তলে তলে। .বুঝতেও পারবেনা। আর ঐ শিউলী?

—কি, শিউলী কি ?

মনোহরের দিকে ফিরে বসে প্রেমতারা। কোঁকড়ানো চুলগুলো এঁটে বেণী বেঁধে মুখে পমেটম লাগায়। বলে,—শিউলিকে দেখতে পাওনা ? ও মেয়ে আর্টিস্ট ভাল। ও মেয়ে মাস্টারের রিজার্ভ-দলের আর্টিস্ট আর····

—আর কি ?

—আর খেয়ে মেখে কেমন চেহারা ফিরেছে দেখনি ? আমি আর জানিনা ? হারাণকে হাত ক'রে মাছটুকু দুধটুকু খেয়ে গায়ে মাংস লেগেছে ছুঁড়ীর। দেখছ না ? ফায়ার-রিং-এর মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চড়ে জাম্প খাবো, সে আমার কতদিনের শখ ? সেই খেলাটি মাস্টার শিউলীকে দিলে। ও মেয়ে জানে, ও-ই একদিন হবে সার্কাস-কুইন।

চোখে জল আসে। স্প্রিং-এর পুত্‌লার মতো দেহটা নিয়ে আছাড় খায় প্রেমতারা ঠাস করে খাটের ওপর। মনের দুঃখে গুম্‌রে কেঁদে বলে,—মাস্টার ওকে রাণী বানাবে, আমার পোশাক ও পরবে। আমার খেলা ও খেলাবে। হ্যাণ্ডবিলে ওর ছবি থাকবে—কেউ সেদিন আর আমাকে পুঁছবেনা কো। আমি জানিনা ওর এত তেজ কেন ?

চোখের জল মোছে। বলে,—তুমি বুঝবেনা। আর মাস্টারকে আমি চটাতে পারবনা এখন।

সে রাতের মতো বোঝে মনোহর। কিন্তু মাথায় তার ভূত চাপে। চট্ করে সে ভূত নামবে কেন ? ট্রাপিজের দোলনায় দোলে প্রেমতারা। প্রেমতারা, শিউলী, চামেলী—যেন তোড়া-বাঁধা গোলাপফুল সারে সারে। যে মেয়ে যেমন হোকনা কেন, সাজলে-গুজলে পরীটি।

প্রেমতারা আশমানে আর মনোহর মাটিতে। লাল, সাদা, কালো মোটা-মোটা ডোরা-কাটা বিচিত্র কোট আর গাঢ় সবুজ প্যাণ্ট

পরেছে মনোহর। মুখখানা রেড-ইণ্ডিয়ানদের মতো চিত্রবিচিত্র করেছে। চোখা টুপীর ডগায় পালক। লটপটে হাত আর সামান্য ছেঁচড়ে চলবার ভঙ্গী দেখেই দর্শকেরা হেসে খুন। এরিনায় রাউণ্ড দিতে-দিতে দর্শকজনের মন্তব্য ক্বচিৎ কানে আসে: ওই যে সুন্দর মেয়েটি দেখছোনা? ও-ই প্রেমতারা।

—সত্যি?

—হ্যাঁ গো! কেমন ডাঁটো দেখিছিস? চমৎকার কিন্তু!

শুনেই ফোঁস করে মনোহর—খেলা দেখতে এয়েছো খেলা দেখে যাও। ওসব দিকে আবার নজর কেন?

দর্শকরাও চটে। গোপীনাথও চটে। বলে,—ভারী মাতব্বর! কে তোমাকে মাতব্বরী করতে বলেছে শুনি? পাব্‌লিক বেচাল করে, কেষ্টবাবু দেখবে, আমি দেখবো। তুমি নিজের কাজে থাকো।

মনোহরকে নিগ্রহ করবার সুযোগ বিধাতা তুলে দিয়েছে হাতে। ছাড়ে কখনো গোপীনাথ সে-সুযোগ? মনোহর আবার কি বলতে চায়। আবার ধমক দেয়,—আর, এরিনার একপাশে দাঁড়িয়ে তুমিই বা মেয়ে-ছেলে দেখ কেন? রাউণ্ড দেবে। খেলা দেখাবে। কেন, বোতলের খেলা শিখে নিতে পারোনি এতদিনেও?

আরো কি, প্রেমতারাও সেই কথাই বলে মনোহরকে,—কেন, মাস্টার যা বলে, শুনতে পারোনা? তুমি—কী!

শুধু তো শরীর সেরে ফিরে আসেনি সুকুলবাবু, মেয়েদের ওপর আরো অনেক অবিশ্বাস আর ঘেন্না নিয়ে এসেছে। তার কাছে শেখা কথাগুলো দিয়েই প্রেমতারাকে আঘাত করে মনোহর। বলে,—মেয়েছেলে মাত্তরে-ই নেমোকহারাম।

—কি বললে তুমি?

—নইলে এখন আমার-ই দোষ হয়েছে আর কোনো গুণ দেখতে পাচ্ছিসনা তুই?

এত রেগে যায় প্রেমতারা যে, বলে,—তুমি খুঁতো মানুষ, নইলে

মুখখানা তোমার আমি ভেঙে দিতাম আজ। এমন কুটিল তোমার মন ?

মনোহর তখন আত্মকরুণায় খেদোক্তি সুরু করে। বলে,—আমার-ই কপাল মন্দ ! নইলে এমন করে হাতটা হারালুন ? এমন সর্বনাশ হলো আমার ? আমি গলায় দড়ি দেব। ফাঁস নে' মরবো, প্রেমতারা। তুমি তোমার মতো থাকোগে যাও।

এই নিয়ে মাঝে-মাঝেই ঝগড়া বাধে দুজনের। চেঁচামেচি, হট্টগোল, হুলুস্থূল। সার্কাস-সুদ্ধু মানুষ ভেঙে পড়ে থামাতে পারেনা ঝগড়া।

উঠ্‌তি বয়সের মেয়ে শিউলী, বয়সের গরমে গেরমানি করতে যায় কেষ্টবাবুর তাঁবুতে। বলে,—এত যখন কামড়াকামড়ি, তখন একসঙ্গে থাকবার কি যে দরকার জানিনা বাবু। বে'-ও তো নিয়ম-মতো হয়নি।

কেষ্টবাবুর বৌ বুকে বালিশ দিয়ে শুয়ে 'প্রনয় পিচ্‌কারী' পড়ছিল। হঠাৎ রেগে যায়। তাকে রাগতে কেউ কখনো ছাখেনি তাই অবাক হয়ে যায় সবাই। তেজী মুরগীর মতো বুক ফুলিয়ে তেড়ে আসে কেষ্টবাবুর বৌ। বলে,—তুই সেদিনের মেয়ে—তোর এত কথা কেন লো ? ওদের ঘর থাকবে, না ভাঙবে, বে' হয়েছে কি না-হয়েছে, তাতে তোর কি ? মোটে বাড়বি না, জানলি শিউলী ?

রাজুকের বৌ মেরী আর চামেলী সকলেই শিউলীকে বকে। শিউলী প্রথমটা চোপা করে। কিন্তু মাসী এসে যখন কানটি মলে নিয়ে যায় গোপীনাথের কাছে, আর গোপীনাথও বাঘের মতো হাঁক্‌রে ওঠে তখন ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেলে শিউলী। সম্প্রতি বড় মুখ হয়েছে তার। প্রেমতারার ওপর হিংসেও হয়েছে। সকলের চোপা খেয়ে শিউলী যায় হারাণের কাছে। শিউলীর চোখের জল মোছাবার ছলায় হারাণকে কাছে আসতে দেয় শিউলী। আর মুগ্ধ

হয়ে যায় হারাণ। বলে,—ওদের সঙ্গে আমাদের কথা! কেন ঝামেলা করিস্ বল্ দিখিনি? আজ মাংস দোব একবাটি। খেয়ে দেখিস্, কী ফাস্‌ক্লাস!

দুপুরে প্রেমতারা মাসীর কাছে যায়। কোন কথা না বলে গালে হাত দিয়ে বসে কাঁদে। প্রেমতারার দুঃখ সকলেই বোঝে। শশী আবার প্রেমতারার কান্না কোনদিনও সইতে পারে না। সে ঠিক করে, পরে মনোহরের সঙ্গে কথা কইবে।

মাসী প্রেমতারাকে সান্ত্বনা দেয়না। প্রেমতারা চোখের জল মুছে সোজা হয়ে বসলে, চামেলী প্রেমতারার চুল বেঁধে দেয়। বলে, —ক'দিনে কী চেহারা কী হয়েছে তারা?

—এমন রূপের মুখে আগুন দে চামেলী-দিদি! নিজের ওপর জানলি, ঘেন্না ধ'রে গেছে।

সার্কাসের মানুষের জীবনে হৃদয়াবেগের অবকাশ কম। তবু প্রেমতারার দুঃখে সকলেই দুঃখী হয়েছে। চামেলী আন্তরিক আবেগে বলে,—যে মদ ধরেছে মনোহর! দেখে দুঃখে যেন বুকটা ফেটে যায়। জানলি তারা? সত্যি, রূপসী মেয়ে যে সুখী হয়না সে তোর কপাল দেখে বুঝলাম। আর মাস্টারের যে কুবুদ্ধি!

মাসীকে বলে চামেলী,—তুমি যে কথা কওনা গো! বলি, একটি জানাশোনা মানুষ তো বটে!

মাসী নাতি-নাতনীর হাতে পায়ে গ্লিসারিন ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে। বলে,—গোপী চিরকাল অমনি ঘোলাপাকের মানুষ!

—আর আমার কি এতবড় শত্তুর মাস্টার? যেদিন থেকে বড় হইছি, সেদিন থেকে আমায় সোয়াস্তি দিল না? কেন, সেই মালদ'তে বে' করতে পারতোনা? ঘর বাঁধতে পারতোনা? যেদিন থেকে নিজের মতো নিজে ঘর বসিছি, জানলে মাসী?—সেদিন থেকে ওর নজরে বিষ লেগেছে। তা ঘরের মানুষ কি তা বোঝে? না,

বুঝতে চায়? এটা বোঝেনা যে, সুযোগ পেলেই ওকে লাথি মেরে তাড়াবে মাস্টার?।

সাতপাকের বিয়ে নয়, তবু বাঁধন বড় মরমে জড়িয়েছে। প্রেমতারার দুঃখ বোঝে মাসী।

শো-এর পর শশী মনোহরকে ধমকে দেয় বন্ধুজনের মতো আড়ালে ডেকে। বলে,—বড় খাঁটি মেয়ে তারা, জান্‌লি মনোহর? ওর তরে কত মানুষকে ক্ষেপতে দেখিছি। ভুষিকলের মালিক তো রোখ ধরিছিল, সার্কাস ছেড়ে দিক, রাখবে তারা-কে। বাড়ি দেবে। টাকা দেবে। তা তুই ওকে মিছে দুষী করিস্‌ কেন? যা হয়েছে, হয়েছে, মানিয়ে তো নিতে হবে।

সবাই মিলে মনোহরকেই দোষী করছে নাকি? প্রেমতারার ওপর জ্বলে মরে মনোহর। চুপ করে যায়। শশীর কথার জবাব করে না।

মানুষের চেয়ে জানোয়ার সকল সময়েই ভালো। দুটো কথা যেন বোঝে বাদশা। বাদশার সঙ্গে মনের কথা কয় মনোহর। আর মদ খাবার কথা যে বলেছে চামেলী, সত্যি সে কথা। দুরন্ত মদ ধরেছে মনোহর। মদ তার ভালো লাগেনা! কিন্তু মদ খেলে দুনিয়া-সুদ্ধু সকলের অবিচারটা সে ভোলে। এতদিনে মনোহর বুঝে নিয়েছে, তার শত্রু মানুষ থেকে বিধাতা সকলেই। নইলে শুধু শুধু এমন কাণ্ডটা হলো?

ছট্‌ফটানি আর জ্বালা-পোড়াটা বইলো প্রথম দিকে। তারপরে আস্তে আস্তে মনোহর নিশ্চুপ মেরে গেল। প্রেমতারার অনেক চেষ্টাতেও যখন ডানহাতখানার তেমন উন্নতি দেখা গেলনা, মালিশ-মলমেও যখন মুখখানার দাগগুলো তেমন কমলো না, তখন হতাশ হয়েই থিতিয়ে গেল মনোহর। কথা নেই। অবাধ্যতা নেই। লাফ-

ঝাঁপ হাঁকডাক নেই। যখন খুসী ফিরুক না কেন তাঁবুতে প্রেমতারা তার ক'রে আর হিংসে নেই মনোহরের।

যখন হিংসে ছিলো তখন কাঁদতো প্রেমতারা। কিন্তু এই চুপচাপ মানুষ, কোনো 'রা' কাড়েনা, সাড়াশব্দ করেনা। এখন তো সুখী হ'তে পারে প্রেমতারা? কিন্তু এখন প্রেমতারা'র মনে সুখ নেই। এখন তার মনে হয় মনোহর যদি হিংসে করতো, সে-ই ভালো হতো। সে বোঝে যে, ভেতরে ভেতরে মানুষটা অভিমানে পাথর হয়ে আছে। বোঝে যে, মনোহরের আর ভবিষ্যৎ নেই। জোয়ান বয়সেই সব শেষ হয়ে গিয়েছে তার। আর এই অবিচার এখনো মনোহরের মনে কাঁচা ঘা-এর মতো দগদগ করছে। প্রেমতারার মনে হয়, বাইরের নিরুত্তাপের আবরণটা যদি ভাঙতে পারে সে, তবে মনোহরের কাছে নিজের প্রেমভরা অন্তরটি মেলে ধরবে। ভালবাসা দিয়ে ঢেকে রাখবে মনোহরকে। তখন মাস্টারের শত নিষ্ঠুরতাও আঘাত করতে পারবেনা মনোহরকে। কিন্তু প্রেমতারাকে ততখানি কাছে আসতে দেয় কই মনোহর?

বাঘটাকে দেখেও ঘাড় কাৎ করে চেয়ে থাকে প্রেমতারা। অকূল বিস্ময়ে দুই নীল চোখ বিস্ফারিত। বনের পশু, তোর মনে এত খল? প্রেমতারার সুখের এমন বাদী হলি? কেন, খেলাবার সময়ে মাস্টার যে মারে? মনোহরের মতো সাহস কার আছে? একদিনের জন্যে চাবুক ধরেনি, অথচ—

ভাবতে ভাবতে আবার খেই হারিয়েছে প্রেমতারা। আর প্রেমতারার এই চিন্তা দেখলেই রাগ হয় গোপীনাথের। বলে,— অনেকদিন তো হলো? বছর ঘুরে গেল। এখনো তুমি ঐ মানুষটার কথা ধরে বসে আছো তারা? মেয়েমানুষ এক আশ্চর্য জাত।

—আগের চেয়ে তো হাতখানি অনেক ভালো, মাস্টার?

—ভালো? তাহলে সব ক্লাউনে এক চাকার সাইকেল টানে, মনোহর আছাড় খেল কেন?

আছাড় খেয়ে কপালটা কেটে গেছে একটু। সেই ভাবনায় দুঃখে প্রেমতারার বুকটা ফেটে যায়। তবু মাস্টারের সামনে হাসে। বলে,—ওরকম বাবু এরিনাতে হয়-ই আমাদের।

গোপী বসেছে খাটে। মাঝে বোতল গেলাস, পেঁয়াজের বড়া। ও-পাশে প্রেমতারা। প্রেমতারার পরনে পাতলা কাপড়, গায়ের জামার ভেতর দিয়ে রং ফেটে বেরুচ্ছে। দেখে-দেখে গোপীনাথ মুগ্ধ। বলে,—একটিবার এসো তারা।

—না মাস্টার।

—বড় তোমার তেজ বাপু তারা। অন্য মেয়ে হ'লে বর্তে যেতো।

—আমি আজ যাই মাস্টার।

—যাবে কি। যেতে দিলে তো?

প্রেমতারার হাত ধ'রে এমন টানে মাস্টার যে, টলে গায়ের ওপর এসে পড়ে প্রেমতারা। উষ্ণ দেহ। গোপীমাস্টারের উচ্ছৃঙ্খল দেহটা ক্ষেপে ওঠে যেন। প্রেমতারাকে লোভাতুর দুই হাতে কাছে আনে। বাইরে এখনো সার্কাসের মানুষ জেগে রয়েছে। প্রেমতারা নিজেকে ছাড়াতে চায়। গোপীর নিঃশ্বাস অবধি আগুনের মতো গরম। ঘাড়ে, গলায়, মুখে, গালে গোপীর মুখের স্পর্শে যেন ফোস্কা পড়ছে। প্রেমতারার শক্তিও কম নয়। ছাড়াতে চেষ্টা করে। গোপী বলে,—হলো তো। রইলে তো দুই বছর ওর সঙ্গে। এবার চলে এসো প্রেমতারা, হতভাগাটাকে লাথি মেরে খেদিয়ে দিই আমি। নিত্যি নিত্যি তোমার এই ন্যাকামি ভালো লাগেনা, প্রেমতারা। তিনকাল কাটালে সার্কাসে, হঠাৎ সতী সাজতে বসলে কেন? মানায় না তোমাকে প্রেমতারা।

—মাস্টার, ছেড়ে দাও।

—বলো, আসবে?

—ছেড়ে দাও, সবাই জানছে।

—জানুক। রাতভোর থাকো-না কেন, কে কি বলবে? যে বলবে তার মুখ আমি বন্ধ করতে জানি।

শরীরটা এলিয়ে থাকে প্রেমতারা। ছটফট করে না দেখে গোপীও একটু হাত আলগা করে। আর রবারের পুতুলের মতো ছিটকে বেরিয়ে যায় প্রেমতারা। এই হাতের মধ্যে ছিলো, এই বেরিয়ে গেল পাখী! গোপী বেরিয়ে আসে। কিন্তু এদিকে ওদিকে আলো জ্বলছে। রাত তেমন নয়। ডায়নামোর তাঁবুতে ধক্‌ধক্ চলছে ডায়নামো। আর যাই হোক, গোপী চট্ করে নিজেকে বিপন্ন করে না। প্রেমতারাকে তাড়া ক'রে মুখ হাসায় না। গালি দিয়ে বসে একটা বিশ্রী। তারপর তাঁবুতে এসে মদ খায় আর-একটু। মনে হয়, বেশী যদি ট্যাঁকট্যাঁকানি দেখায় প্রেমতারা, তো তাকেও দেবে জুয়েলের মতো...জুয়েলের মতো? না। কোথায় জুয়েল আর কোথায় প্রেমতারা! জুয়েল ছিলো ঠাণ্ডা। প্রেমতারা যেন আগুন লাগিয়ে দেয়!

প্রেমতারাকে চাই-ই গোপীর।

নিজের তাঁবু-পানে ছুটতে গিয়ে বুকে হাওয়া লাগে প্রেমতারার। জামাটা ছিঁড়ে গিয়েছে। বুকে বাতাস লাগছে। আঁচল টেনে চাপা দেয়। তাঁবুতে ঢুকে আঁধারে চোখ চলে না। এখন মনোহরকে চাই প্রেমতারার।

খাটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে মনোহর। বাতিটা জ্বালে প্রেমতারা। ক্লাউনের মেক্‌আপ-ও মোছেনি? মদের গন্ধে ভরপূর বাতাস। ঘেন্নায় রাগে জ্বলে যায় প্রেমতারা।। ধাক্কা দেয়।—ওঠো! ওঠো! নিজের জায়গায় যাও!

অনেক ধাক্কাতে ওঠে মনোহর। আধখানা দেহ তোলে কোন মতে। বলে,—কেন মিছে ঝামেলা করিস্? বেশ তো ছিলি।

তারপর প্রেমতারার কথা না শুনেই আবার গড়িয়ে পড়ে মনো-হর। রাগে ঘেন্নায় মনোহরকে দুটো-চারটে চড়-চাপড় মারে প্রেম-

তারা। নির্মম হয়ে হ্যাঁচ্‌কা টানে মানুষটাকে মাটিতে নামিয়ে দেয়। মনে হয় এক আকাশ শাপমন্যি টেনে নামায় ঐ বেইমানের ওপরে।

কয়দিন বাদে প্রেমতারার তাঁবুতে গভীর রাতে আবার অন্য সুর শোনা যায়। মনোহরই বুঝি বা জেগে বসেছিলো, কিন্তু প্রেমতারার ফিরতে অনেক দেরী হয়েছে। মনোহর মনের জ্বালায় ছোবল দিয়ে বসে—রাতের আর বাকি কি? নয় না-ই ফিরতে প্রেমতারা? কে বলেছিলো ফিরতে?

কত আর সইতে পারে মানুষ? প্রেমতারা বলে—বসে না র'য়ে শুয়ে পড়্‌লেই পারতে? ভাল লাগে না বাবু।

—এই দেখ মেয়ে, মুখ সামলে চলবে।

মনোহরের মুখের গন্ধ চিনতে আর ভুল হয় না প্রেমতারার। বলে—কেন? ম'দো-মাতালের ভয়ে? মনোহব বুঝি বা মেরেই বসে, প্রেমতারা বলিষ্ঠ হাতে সে হাতখানা ধাক্কা মেরে হটিয়ে দিয়ে বলে—ভোর না হতে রাউটি। ঘুমুতে দাও বাবু।

—তো, যাওনা কেন, ঘুমোও গে' যেখানে ছিলে।

মনোহরের কুৎসিত কথাগুলো শুনে প্রেমতারা কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়। বলে—তোমার মতো নেমোকহারাম বজ্জাতকে মাস্টার যে আজও পুষছে সে তোমার বাবারকেলে ভাগ্যি, জানলে?

মনোহরের মুখের দিকে চায় না প্রেমতারা। বড় দুঃখে তার সোনার অঙ্গে কালি পড়েছে। গোপীনাথ আর মনোহর, এই দু-কূল রাখতে গিয়ে কণ্ঠার হাড় বেরিয়েছে, চোখে মুখে সে ফুর্তি নেই, হাসি নেই। কিন্তু নিজের দুঃখের কথা বলেনা প্রেমতারা। বলে—এই সব কথা যে তুমি দিবারাত্তির মনে মনে ঘোঁট পাকাচ্ছ, বল দিখিনি, তাই শুনে যদি মাস্টার তোমাকে আমাকে লাথ মেরে খেদিয়ে দেয় তবে কি করবে?

মনোহর বলে—তোমারে তাড়াবে না গো প্রেমতারা—সে আমারেই দেবেখ'ন খেদিয়ে। তা দিলে-ও তো পারে।

—ভাঁড়ামী ক'রোনা বাবু। ভাঁড়পণা ক'রে নেকামী ক'রোনা। আমি চলে গেলে আমার মতো দশটা প্রেমতারা এক ডাকে পাবে মাস্টার, জাননা? না কি বোঝ না?

—আমি ভাঁড়? আমি ক্লাউন?

এবার সত্যই মনোহর ক্ষেপে যায়। ধেনোমদের ঝাঁজ আর প্রেমতারার কথা, কোন্‌টিতে যে আগুন লাগে কে তা বলবে! মনোহর এবার হাসতে থাকে—তা ভাঁড় ঝখন। তখন ভাঁড়ামি করি। সোনার পাথরবাটি, কি বল প্রেমতারা? কখনো সম্ভব হয়? বারো বছরের ছেলের ঘাড়ে আশী বছরের মাথা। কখনো সম্ভব হয়? হাঃ হাঃ, কি বল প্রেমতারা, সম্ভব হয়?

ভেতর থেকে ঝলকে ঝলকে হাসি উঠতে থাকে। মনোহর দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ে। পেটে হাত ধ'রে হাসতে হাসতে বলে—সম্ভব হয়? বল না গো?

তারপর গলাটা নেমে আসে। নতুন লম্বা আয়না খানায় নিজের ছায়া পড়েছে। ছায়া, না ওটাই সত্যি? সে তো হাসছে, তবে ঐ মানুষটার মুখে এমন মূর্ত হতাশা কে এঁকে দিল? ভূতে পাওয়ার মতো মাটিতে হাঁটু গেড়ে ব'সে আয়নার কাঁচে হাত বুলোয় মনোহর ভয়ে ভয়ে। ক্লাউনের নাক, ঠোঁটে লাল রং। কপালে আঁকজোক কাটা, ছায়াটার চোখ দিয়ে জল নামছে বুঝি? রঙের ওপর দিয়ে? ছায়াটার চোখে জল, তো মনোহরের জিভে কেন এমন লবণাক্ত চট্‌চটে স্বাদ? মনোহর এবার ছায়াটাকেই জিজ্ঞাসা করে—সম্ভব হয়? ছায়া জবাব দেয়না। তখন মনোহর হা হা ক'রে চোখের জল বিনে-ই কেঁদে ওঠে—সম্ভব হয় না, তুই প্রেমতারা আর আমি নফর, আমি মনোহর—সোনার পাথরবাটি কোনকালেও সম্ভব হয়না রে তারা—তুই আমারে ছেড়ে চলে যা!

মাটিতে মুখটা ডুবিয়ে ফেলে মনোহর। পাঁজরগুলো চেপে ধরে দুই হাতে। তবু সে কান্না রুখতে পারেনা।

॥ ১১ ॥

সম্ভব হলোনা। সোনার পাথরবাটি যেমন সম্ভব হয়না, মনোহর আর প্রেমতারার ভাঙা মন জোড়া লাগা-ও যেন তেমনি অসম্ভব হলো। কিন্তু একদিন এমন ক'রে ভালবেসেছে দুজনে, যে সেই জন্যেই যেন বাধ্যবাধকতার বাঁধন রয়ে গেল। মদের শেষের তলানিটুকুর মতো। বিস্বাদ, তবু-ও তার আকর্ষণ আছে। ভালবাসার সে রংবাহারী আগুনের ফুলকি নিভে গিয়েছে। তবু যেন প্রেমতারার মনে হয় আছে কোথাও। মনোহরের ঐ গোলমেলে মনটার জড়ানোপাকের কোনো কোণে রয়ে গিয়েছে সেই তুষের আগুন। প্রেমতারা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করে, যেমন ক'রে হোক খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেই আগুনটুকু জ্বালাবার। এত ছিলো সব ফুরিয়ে গেল? কেমন করে হয়? মানতে চায়না প্রেমতারা। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে এক এক সময় আর্শী ধরে। কেন এখনো তো নিটোল স্বাস্থ্যে টান টান মুখের চামড়া। নীল চোখ দুটি কি দুঃখে বিভ্রান্ত? হলেই-বা। কটা চুলে এখনো কেমন ঢেউ খেলানো। সবই তো তেমনি আছে। নিজের মনখানা! মনটি যদি বদলে যেতো তবে ঐ হতভাগার ক'রে দিবারাত্রি হুতাশে কাঁদে কেন মন? একেই বুঝি বলে 'ধিকি ধিকি অনলে মন জ্বলে সখী লো!' এই গান কতদিন তাকে শুনিয়েছে মনোহর কিন্তু মনোহর তো বলে দেয়নি যে গানের কথা এমনি ক'রে সত্যি হয়। কেন বলে দেয়নি? এখন যে মনটি জ্বলে জ্বলে আঙার হলো, তার নিরসন কেমন ক'রে করে প্রেমতারা?

মনটা এমন হয়েছে, যে কি করবে ভেবে পায়না প্রেমতারা। মনে হয় সাংঘাতিক একটা কিছু করি। একদিকে মনোহর আর একদিকে গোপী, দু'জনে তাকে এমন পাকে ফাঁস দিয়েছে, যে

সাংঘাতিক কিছু একটা না করলে পরে এই অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাবেনা প্রেমতারা। ট্রাপিজে তুলতে তুলতে মনে হয় দিই দোলনার দড়ি কেটে। হোক্ একটা সর্বনাশ। রাতের বেলা গোপীর তাঁবু থেকে ফিরতে ফিরতে মনে হয় মনে এত আগুন রয়েছে, দিই খানিকটা ছড়িয়ে এই তাঁবুটার ওপর। পুড়ুক সব কিছু। খেলা দেখাতে গিয়ে নম্বর ভুলে যায়। তার প্রত্যেকটা ভুলচুকের সুযোগ নিয়ে শিউলী নিজের অধিকার একটু একটু ক'রে বাড়াচ্ছে। চামেলি বলে——তোর হলো কি তারা? আজ-ও ঈস্টার্ণ সাইকেলে ভুল করেছিলি? মাস্টার দেখছে জানিস্না?

—দেখুক। ভয় করি আমি?

—ভয় ভাবনার কথা নয় লো। ঐ শিউলীকে দেবেখ'ন তোর নম্বরগুলো ঝপ্ ক'রে।

—তার আগে ঐ শিউলীকে আমি দা চোপা করবো। হ্যাঁ! মনমেজাজ ভাল নেইকো।

—পাগল হলি? হ্যাঁ তারা? অমন ধারা কথাবার্তা কইতে তোকে কে বলেছে?

শশী বকে ওঠে। শশীর কাছে চিরদিনই প্রেমতারা ছোটবোনের মতো। আজ শশীর সঙ্গে নাকফুলিয়ে ঝগড়া ক'রে কাঁদতে বসে প্রেমতারা। বলে—আমার কথা তুমি কি বুঝবে শশীদাদা? আমার মনে ঝা হচ্ছে, জানলে শশীদাদা? মনে হয় যে গলায় ফাঁস দিই গে' যাই। আর ঐ শিউলী হয়েছে আমার মরণ। সর্বনাশী আমার জায়গাটি নেবে ব'লে মুখিয়ে রয়েছে দেখনি?

শশী প্রেমতারাকে সান্ত্বনা দেয়। বলে,—অন্য দলে যা না কেন তারা? বলিস্ তো বাজিয়ে দেখতে পারি।

—তারা ওকে নেবে? রইতে দেবে?

—না-ই দিলো।

ব'লে চেয়ে থাকে শশী। এ প্রায় সোজাসুজি বলা-ই হলো,

যে পড়ছেনা যখন, তখন ছেড়ে যা মনোহরকে। বোঝে প্রেমতারা। বলে,—পারবনা যে শশীদাদা।

—পারবিনা ?

—না।

ব'লে শশীর হাঁটুতে মাথা রেখে অল্প কেঁদে নেয় প্রেমতারা। তারপর সোজা হ'য়ে ব'সে বলে—ও কেন যাক্‌না এখেনে সেখেনে কাজ নে' ?

—তা হ'লে ?

ম্লান হেসে প্রেমতারা বলে—তা হ'লে নয় আমি মাস্টারের তাঁবুতে-ই যাবো। ঝা হোক একটা দিশা হবে-ই। একটা জীবন, ঠিকই চলে যাবে।

—পারবিনা তারা।

—পারবনা কেন গো ? সুখ তো আর ফিরে হবেনা—তাই দুঃখু-ও পাবনা। আর মাস্টারের কল্‌জের জোর তো জানা আছে। ঐ আপ্তসুখী লোক, ও দুঃখ-ই দেবে কি বল আমাকে ? সুখদুঃখের ও বোঝেই ভারী।

ব'লে আঁচল গুছিয়ে উঠে পড়ে প্রেমতারা, বলে—আমি ছেড়ে গিয়ে অন্য ঠাঁই-এ মরি কেন ? তার চে' ঐ হতভাগা চলে যাক্‌না কেন। ঝা হয় করুক্‌গে—চোখের সামনে তো রইবেনা অষ্টপহর, আমারও অত জ্বলবেনা।

দু'জনেই সমান। মনোহরকে কথা কইতে গিয়ে শশী ধমক খায় উল্টে। মনোহর বলে—ঝা হয় করবোখ'ন আমি। তুমি পরের ব্যাপারে নাক গলিওনি তো শশীবাবু।

ক'দিন সময় হলোনা। যেদিন সময় হলো, প্রেমতারাকে বললো কাটা কাটা কথায়। ঘায়ে লবণ ছিটিয়ে ছিটিয়ে—শশীকে দিয়ে সালিশ মানাতে এয়েছেন ? কেন, নিজের বলতে লজ্জা হচ্ছে ? রাত বারোটা অবধি থাকো, সারাদিন পড়ে থাকো, নামে যশে

দশজনকে জানিয়ে উঠে যেতে বুঝি বাধ্‌ছে? না কি লজ্জা পাচ্ছ তারা?

জবাব না ক'রে প্রেমতারা চোখ ছোট ক'রে চেয়ে রইলো। মানুষটার মনের বিকার কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাই দেখলো। জবাব না পেয়ে মনোহর বড় অন্যায় করলো। বললো—বুঝিনা আমি, যে ঘর ভেঙেছে আমার? তোর হয়ে ক-জনা সালিশ মেনে যাচ্ছে হিসেব রাখিস? কেষ্টবাবু থেকে মাস্টার, সকলে হয়েছে তোর আপনার জন। পরভালানী ঘরজ্বালানী। ঘরে আগুন দে' পরের কোলে মাথা রেখে রঙ্গ করতে চাস?

ঘা দিতে দিতে প্রেমতারাকে রক্তাক্ত করবে এই ছিলো মনোহরের অন্ধ মনের ইচ্ছে। কিন্তু ঘা খেলে সার্কাসের মেয়ে কি রূপ ধরবে তা তার অজানা ছিল। হিংস্র আর ভয়াল কোনো ভরা জোয়ান বাঘিনীর মতোই জ্বলতে লাগলো প্রেমতারার চোখ। নিচু-গলায় প্রেমতারা বললো,—বল্, থামলি কেন? তারা হাজারবার আমার আপনার জন। তুই আমায় কতদিন ধরে জানিস? তারা আমায় খাইয়েছে, পরিয়েছে এত বড়টা করেছে।

—বলতে লজ্জা করছে না?

—না। আর কথা যখন তুললি, তখন তোকে বলি শোন্—পড়ো খুঁতো মানুষ বলে অনেক দয়া করিছি তোকে জানলি? তোর হাজারটা ব্যাভার গায়ে মাখিনি কো। কিন্তু তুই যখন এতোখানি নেমোক হারামী করলি—তখন তোরে আমি আর ছেড়ে কথা কইবনা।

—তুই আমাকে দয়া করিছিস? এ্যাঁ! আমি তোর দয়ার ভাত খাই?

বাঁ-হাতখানা সাপের মতো প্যাঁচাতে চায় প্রেমতারার গলা। হিংসায় রাগে জানোয়ার হয়ে ওঠে মনোহর। প্রেমতারা ইচ্ছে করলে পাণ্টা ঘা দিতে পারে কিন্তু দেয়না। মনোহরের বাঁ-হাতখানা

ঠেকিয়ে রাখে শুধু। শরীরে আঘাতের চেয়ে আরো অনেক মর্মান্তিক জ্বালা দেয়। বলে—শুধু কি আমি? মাস্টারের অশেষ দয়ার শরীর, তাই তোর মতো নেমোকহারামকে পুষছে লোস্‌কান দিয়ে। তোর অসাবধানে সার্কাসের লোহার দড়িগুলো চুরি হয়ে গেল সে ছ'শো টাকা তুই শুধতে পারবি কোন দিন?

—জিভ দিয়ে বিষ ছেটাচ্ছো? তোমার ও মুখ আমি ভেঙে দোব মেরে, পঙ্গু হাতখানা লটপপট করে উঠে আসে বারবার প্রেমতারার মুখে। ধাক্কা লেগে নিচের ঠোঁটটা কেটে যায়। রক্ত পড়ে। প্রেমতারা তুই হাতে ঠেলে দেয় মনোহরকে। ঝট্‌কা দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে,—তুই এখনি বিদেয় হ'। চোখের চামড়া নেই তাই এতদিন ধরে পড়ে আছিস। তুই দূর হ'।

—দূর হব তার আগে তোর ঐ রূপের গরব আমি ভেঙে দে' যাব। ঝে কটা রঙের গরবে তেজ কর তুমি—

রাগে অন্ধ মনোহর বোতলগুলো হাতড়ায়। ঝন্ ঝন্ করে পড়ে বোতলগুলো। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে ক্লাউনের কাঠের হাল্কা মুগুরখানা নিয়ে ছুড়ে মারে মনোহর। প্রেমতারার কপালে লেগে অদ্ভুত একটা শব্দ হয়। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটে বেরোয়। নিমেষে একদিকের চোখ আর গাল ঢেকে রক্ত পড়ে।

—তুই মারলি আমার?

এতদিনের প্রেম, এত কথা, এত ত্যাগ, সব ভুলে যায় প্রেমতারা। এই লোকটার জন্যেই সে সকল সুখশান্তি জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছে? তু'জনে তুজনের দিকে চেয়ে ফুঁসতে থাকে। মানুষ নয়, তুটো আদিম রিপু যেন। তুটো জান্তব বৃত্তি। এ ওর বুক ফেঁড়ে রক্ত খেতে না পারলে শান্ত হবেনা যেন। প্রেমতারা এবার ঝাঁপিয়ে আসে বাঘিনী হয়ে। বলে—এতবড় চামার তুই? দূর হ', দূর হ' এখনি।

তুপুরের বাতাস চিরে প্রেমতারার গলা ফেটে ফেটে পড়ে। লোক ছুটে আসে চারিপাশ থেকে। প্রেমতারা কারু দিকে লক্ষ্য করেনা।

—অনেকদিন সয়েছি। কিন্তু তোর জাত আলাদা, জানিস মনোহর? তুই একেবারে মাথায় চড়িছিস্। . তো ভালই হলো। তুই ভেবেছিস্ আমি পারিনা?' তো দিলাম শেষ ক'রে—যা বেরো। বেরো আমার সুমুখ থেকে—

তাঁবুর দোরের কাছে ঠাস্ করে এসে পড়ে মনোহরের জামা কাপড়, ক্লাউনের মুখোস, লাল রঙের গেঞ্জী, তার বুকে সুতোর টিয়াপাখী। আয়না পড়ে ঠাস্ করে। কাঁচের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে। তাঁবুতে ঢুকতে যেয়ে ঢুকতে পারেনা কেউ। সর্বনাশটা ঘটিয়ে এতক্ষণে ভয় পেয়েছে মনোহর। একটা করে জিনিস পড়ে আর সে চম্‌কে চম্‌কে বাঁ হাতখানা তোলে মুখের সামনে, যেন মার বাঁচাচ্ছে। প্রেমতারার দুনিয়া তখন দাউদাউ করে জ্বলে গিয়েছে। তার চোখের সামনে শুধু ছাই আর আঙারের স্তূপ—তার বাইরে আর কোন প্রেম, কোন বিবেচনা নেই। এদিক ওদিক দেখে প্রেমতারা ফোঁসে। এবার দ্বৈতজীবনের সাধকামনার মনোহারী টুকিটাকি জিনিস যতো আছড়ে আছড়ে ফেলে। সবুজ রঙের টিয়াপাখী লণ্ঠন, জাপানী কাঁচের গেলাস, জল খেতে মুখডুবোলে তার তলায় উড়ন্ত মেম পরীর ছবি দেখা যায়, সেগুলো ভাঙে। কাপ, ডিস বাসন-পাতি, পালকের ঝাড়ন, বাঘ আঁকা জাপানী মাছুর, সব ফেলতে থাকে। নগ্নদেহে স্নানরতা মেমের ছবি, মনোহর আর প্রেমতারার ফোটো; হিমানি সাবানের বাক্স ভরা কাঁচের চুড়ি, মাথার ফিতে। মনোহরের বড় সখের জলের বয়ামে খলশে মাছগুলো সুদ্ধ বয়ামটা ছুড়ে মারে। তারপর মনোহরকে দেখে রক্তমাখা কপালটা মুছে ছুটে আসে। ঠেলতে থাকে। বলে—বেরো বেরো এখনি। মরিছিস্ তুই আমার চোখে—আমি নিশত্তুর হইছি। বেরো।

--এই ছাখ এই তারা, ব্বাপু রে, পাগল হয়েছে--এই তারা শোন···

মনোহর বিব্রত ও শুকনো মুখে মিনতি করতে থাকে। কিন্তু কোন কথা না শুনে প্রেমতারা তাকে বের করে ছায়।

চারিপাশে ভাঙাস্তূপ। একটা সার্কাসের মেয়ের সারাটাজীবনের

সঞ্চয়। সার্কাসের মানুষ প্রেমতারাকে দেখে চম্‌কে যায়। মুখে কথা সরে না কারু। —বেরো, বেরো, বেরো, দূর হ, মরিছিস্ তো লাস হয়ে আমার গলায় ঝুলিস্‌না, বেরো......বলতে বলতে বুক দিয়ে ঠেলে মনোহরকে নিয়ে প্রেমতারা তাড়া করে খানিকটা দূর যায়। তারপর নিজেই একটা সাপেকাটা মানুষের মতো লাট খেতে খেতে ফিরে আসে। তাঁবুর ভেতর এসে—ও মা গো-বলে একটা বুকফাটা চীৎকার করে আছাড় খেয়ে পড়ে যায়।

মাসী ছুটে এসে প্রেমতারাকে বুকে তুলে নেয়। শশী সকলকে তাড়িয়ে জলের কুঁজো নিয়ে ছুটে আসে। বুকের কাছে কি যেন ধরে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে শিউলী। চামেলীর কাপড় চোপড়ের দিশানেই, সে পাখা হাতে আসছিল শশীর পেছনে। শিউলীকে দেখে সে দাঁতে কথা কেটে ছুড়ে মারে। বলে—খবরদার আসবিনি।

তবু শিউলীকে রোখা যায় না। চোখে জল, মুখসাদা, শিউলী চামেলীকে ঠেলে ঢুকে যায়। তুলোতে আইডিন ঢেলে চেপে ধরে কপালে। আঁচল ভিজিয়ে রক্ত মুছতে থাকে। তারই দাঁতে দাঁতে শব্দ হয়।

মাসী অভিজ্ঞ হাতে কাটা দেখে। বলে—কিছু হবে না। সামলে যাবে।

আবার চুপচাপ। শিউলীর দাঁতে দাঁতে লেগে যা শব্দ হচ্ছে সামান্য।

—যা আমাদের তাঁবুতে বিছনা দে গে যা চামেলী। নে যাই, বলে শশী উঠে গিয়ে বিমলকে ডাকে। সকলে ধরাধরি করে নিয়ে যায়। শিউলী বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। যেতে গিয়ে ফিরে তাকায় চামেলী। রাগ ভুলে যায়। বলে—আয় আমার সঙ্গে আয়।

বর্তে যায় শিউলী। চামলীর সঙ্গে সঙ্গে চলে। হঠাৎ নাকটেনে বিশ্রীভাবে ফ্যাচ করে কেঁদে ফেলে। বলে—মরে যাবে না তো গো চামেলীদিদি?

—মরবে কেন ? কেষ্টবাবু দেখেনি এখনো। ঔষধ দেবেখ'ন।

যার শত্রুতা করা ছাড়া এতদিন অন্য চিন্তা ছিলোনা শিউলীর—আজ সেই প্রেমতারার জন্যেই শিউলীর মনটি ডুকরে ডুকরে কাঁদে। শিউলীর মন বলে হে ভগবান তারাদিদিকে ভাল করে দাও।

সার্কাসে আর্টিস্ট সকলেই। কিন্তু সকল খেলার মালিক যেমন গোপীমাস্টার, মানুষের জীবনের বেলাতে-ও সে-ই হলো মালিক। মনোহর আর প্রেমতারার ঘর ভাঙলো যতক্ষণ ধরে, বাইরে দূরে দাঁড়িয়ে বুকের উপর দুইহাত আড়াআড়ি করে মুড়ে গোপীনাথ সব দেখলো। তারপর অবতীর্ণ হলো সে। প্রেমতারার প্রেমের ভাঙা বেসাতিগুলো দুই পায়ে মচ্ মচ্ করে মাড়িয়ে তাঁবুটি ভাল করে দেখলো। তারপর শক্ত হাতে সমস্ত ঘটনাটির হাল মুঠোকরে ধরলো। বললো—কেষ্ট, কোম্পানীর আর্টিস্টকে খুঁতো করেছে মনোহর। জিনিস ভাঙচুর করে নষ্ট করেছে, ওকে ডিসমিস করবার আগে সব হিসেব করে কেটে নিবি। আর খুব সাবধান। মনোহরকে নজরে রাখবি।

ভাঙা কাঁচে পা বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসে গোপীনাথ। সুকুলবাবুকে দেখে বলে—আপনাকে-ও সাবধান করছি সুকুলবাবু উসকোনি দিয়ে দিয়ে মনোহরকে আপনিই এই রকম করেছেন। নইলে এত বাড় বাড়াতোনা জানলেন ? সব সমান। কুত্তার জাত। লাই পেয়েছে কি মাথায় উঠেছে। দিতে হয় জুতিয়ে আগাপাছতলা।

দূরে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে থাকে মনোহর। আর সে একটা কথাও কইতে পারে না। বৃথাই মনোহর এর ওর দিকে চায়। কারু কাছ থেকে এতটুকু সহানুভূতি-ও পায় না। আস্তে আস্তে যে যার মতো সরে পড়ে। ভাঙা ঘরে এসে বসে মনোহর। উলটে ফেলা ট্রাঙ্কটার ওপর বসে। দু'হাতে মাথাটা ধরে। কি হয়ে গেল বুঝতে চেষ্টা করে একবার। তারপর দেখে অনুভব বা উপলব্ধির কোন ক্ষমতাই নেই। চুপ করে বোবা ধরে বসে থাকে মনোহর।

মনটা ভয় খাওয়া জন্তুর মতো কুঁকড়ে থাকে। এক একবার ছুটে যায় মনটা চামেলীর তাঁবুতে। কিন্তু সেখানে গেলে হয়তো বা জুতো সত্যি সত্যিই খেতে হবে। এই তাঁবুটা যেন তবু আশ্রয়।

ওদিকে গোপীনাথ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলো। আঘাত তেমন নয়। ঔষধ দিয়ে বেঁধে দিয়ে গেল ডাক্তার। গোপী সকলের সামনে প্রেমতারার বিছানায় বসলো। নিঃসাড় হাতখানা তুলে নিয়ে নাড়ী দেখলো যেন। তারপর বললো—এখেনে হাওয়া খেলে না তারা। আমার তাঁবুতে চল দিখিনি, হ্যাঁ।

অদ্ভুত ভাবে হাসলো প্রেমতারা। বললো—যাব মাস্টার। নিশ্চয় যাব।

এমনি করে স্বল্পকথায় সব বলাকওয়া হলো। গোপীনাথের হাতের পাঞ্জায় আজ প্রেমতারা ধরা পড়েছে। গোপীর দোষ কি? মাসীর দিকে না তাকিয়ে প্রেমতারা ধীরে ধীরে বলে—মাস্টারের কি দোষ? আমি ঝখন পারলাম না, তখন সে ত এ কথা বলতেই পারে।

এক সর্বনাশের ওপর আর এক সর্বনাশের সিদ্ধান্ত কেমন করে নেয় প্রেমতারা? আজ আর বুঝতে দেরী হয় না কারুর। এমন রূপযৌবনের সাধের ঘর যার মনের মানুষ লাথি মেরে ভেঙে দেয় সে তো সব সর্বনাশের মুখে সেধে পা বাড়াবে। আর কোন্ ভয় রইলো তার?

গোপী যে তাঁবুতে নেই, তা ফিরেও দেখেনা প্রেমতারা। অন্য কাতে ফিরে আস্তে আস্তে বলে—নিজেকে নিয়ে ঝ্যানো আমিও আর পারছিনা। যাব বই কি মাস্টার, যত তাড়াতাড়ি হয় যাব।

চোখ রাঙা করে গরম মুখে মাথা নিচু করে থাকে শশী, প্রেমতারার মাথায় হাতখানি রেখে। নিঃশব্দ তাঁবুতে শুধু একটা নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। প্রেমতারা নয়, চামেলী নয়, নিঃশ্বাস ওঠে মাসীর বুকের ভেতর থেকে। এত দেখেছে যে মানুষ তার-ও

বুকের ভেতরটায় বোবা দরদে কলজেটা মোচড়ায়।—হারে ভগবান! বলে বসে থাকে মাসী।

দু'দিন বাদে রাত হয়েছে। গোপীর হাতের বাঁধনে বসে আছে প্রেমতারা। এমন করে বসে আছে, যে দেখে মনে হবে, এমন করে এরা না জানি কতদিন কতকাল বসে আছে। গোপীর একখানি হাত প্রেমতারার আঁটো গেঞ্জী পরা কাঁধখানার ওপর, গলাতে, বুকে থাবড়ে থাবড়ে আদর করছে। যাকে আদর করছে, সে একমনে চেয়ে বসে আছে। গোপীনাথ বুঝতে পারছে না, যে যাকে আদর করছে, সে একটা নিষ্প্রাণ দেহ। সে দেহে কোন পালটা সাড়া নেই। দু'জনের এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ দেখে, এ কথা মনেই হয় না এদের মাঝখানে মনোহর বলে একটা মানুষ কোনদিনও ছিলো। আর সে মনোহর এখনো এই দলে-ই আছে। খোলা তাঁবুতে ড্রাম বালতি দড়িদড়ার পাশে পড়ে আছে। বরখাস্ত হয়ে গিয়েছে আজ। চলে যাবে কাল।

গোপীনাথ কোন কথা ভোলেনা। বাঘের খাঁচাটি সে নিজের তাঁবুর কাছে আনিয়েছে। প্রেমতারা বলেছে—যদি বিষ দেয় বাঘকে বিশ্বাস কি ওসব মানুষকে মাস্টার? বিষ দেয় তো লোসকান হবে কার? গোপী তাকে জাপটে বলেছে—তোমার-ও লোসকান তারা, আমার এ কোম্পানী তোমারই হলো। প্রেমতারা সে কথা শুনে খুসীতে ডগমগিয়ে ওঠেনি। গোপী বিশেষ খোঁচায়নি। বসবে, মন বসবে। বসবে না তো কি। যাক্ ঐ হতভাগা। ক-টা দিন কাটুক। এই দেহ মন সব নিয়ে প্রেমতারা তারই হবে। আর বদলাবে যে, তার নিশানা গোপীনাথ তো এখনি পাচ্ছে। কি সে রাগ মনোহরের ওপর! পারে ত' নখে দাঁতে ছেঁড়ে। গোপী-ই বলে কয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে। না, মেরো না তারা। ওকে মারা মানে ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করা। ঝেড়ে ফেলে দাও দিখিনি মন থেকে।

মাস্টারের কাছে এ রাত বড় আনন্দের রাত। তাই ঢেলে মদ খেয়েছে মাস্টার। প্রেমতারার করে তার আকাঙ্খাটা আজকের নয়। সেই কতদিন থেকে এই মেয়েটির জন্যে মন তার হাত বাড়িয়েই ছিলো। আজ সেই মেয়ে তার ঘরে, তার খাটে, তার পাশে। বিশ্বাস হয় না। তাই প্রেমতারাকে একবারটির জন্যে-ও ছাড়েনি গোপীনাথ। সমানে ধরে আছে। ধরে আছে আর সম্পত্তিজ্ঞানে সমানে কাছে টানছে।

গোপীর প্রমত্ত নিঃশ্বাসে বুকটা পুড়ে যায় প্রেমতারার। আর যেন সহ্য হয় না। কিন্তু অবস্থা এখন বাদ প্রতিবাদের বাইরে। গোপী নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে ফেলে প্রায় প্রেমতারাকে। বলে—কতদিন ধরে চেয়ে আছি প্রেমতারা। ও হতভাগা যদি না যেতো, তবে আমিই ওকে শেষ করতাম।

—আমার ও আর সইছিল না মাস্টার। প্রেমতারা হাসতে চায়। হাসতে চায় কিন্তু হাসিটা মাঝপথে হারিয়ে যায় কোথায়। গোপী কিছু দেখে না। নিজের ঝোঁকে ঝুঁকেঝুঁকে কথা বলে। বলে—প্রেমতারা কতদিন এমনি ধারা একা বসে বসে তোমার কথা ভেবেছি জানো? তুমি আমাকে কম দুঃখু দাওনি তারা।

এ কি কোন প্রেমপ্রার্থী মনের অপকট স্বীকৃতি? না কি নেহাৎ-ই কথা কওয়ার সুখে কথা কয়ে চলা? ভাবতে-ও চায়না প্রেমতারার মন। মন বলে কি কিছু আছে তার? না দেহ, না মন, কোনটাই সাড়া দেয়না গোপীনাথের কথায় বা স্পর্শে। গোপীনাথ চেয়ে দেখেনা এই যা রক্ষে। গোপী বলে—একটা বাউণ্ডুলে হতভাগার জন্যে এই বছর ক-টা নষ্ট হলো। আমার-ও তো বয়স হয়েছে। এখন একটু যত্নআত্তি পেতে ইচ্ছে করে তারা। আর তুমিই বা কতদিন খেলা দেখাবে বলো? কেনই বা দেখাবে? আমি তোমাকে টাকা লিখে দোবো তারা। গা ঢেকে দেবো গয়নায়।

—মাস্টার তোমার নেশা হয়েছে, তুমি শোও।

—আর তুমি?—সন্দিগ্ধ চোখে চায় গোপীনাথ। বলে—বিশ্বাস নেই তারা। আমি চোখ বুঁজলেই ঐ হতভাগার কাছে যাবে না ত?

—গেলে ছুরি নিয়ে যাব মাস্টার। শেষ করে দে আসব।

না না! বলে গোপীনাথ বোতলটা গড়িয়ে দেয়। ঠাস্ করে পড়ে বোতলটা লণ্ঠনের ওপর। ভেঙে নিভে যায় লণ্ঠন। কেরোসিনের গন্ধ আর গরম একটা ভাপ ওঠে। গোপী এবার মালিকের হাত বাড়ায়। বলে—এসো তারা।

অনুভূতিগুলো না মরে গিয়েছিল, তাই না আত্মদান করা সোজা হবে বলে নিজের মরা শরীরটা নিয়ে এসেছিল তারা? কিন্তু এমন হলো কেন? ভেতর থেকে সবটা যেন বিদ্রোহ করে। তারস্বরে বলে —না, না, না।

—এ কি তারা?

প্রেমতারা একবার মাথা ফেরায় এদিকে একবার মাথা ফেরায় ওদিকে, কিন্তু আজ আর গোপীনাথকে রোখা সম্ভব হয়না। বাধা দেবার মতো শক্তিই বা কোথায়? গোপীর গলাটা গরম নিঃশ্বাসের ঝলকে ঝলকে বিশ্রী শোনায়—এখনো বিষদাঁত ভাঙেনি তোমার? তোমাকে আমি আজ!

প্রেমতারা ভাঙা ভাঙা কথায় মিনতি করে—মাস্টার মাপ করো তুমি আমাকে, মাস্টার!

সে কথা কানেই যায়না গোপীনাথের। অন্ধকারটা, যার কোনো অবয়ব ছিল না সেটাই এবার যেন গোপীনাথ হয়ে রক্ত মাংসের স্থূল দেহ নিয়ে পিষে ফেলে প্রেমতারাকে। ঢেকে দেয় নিশ্চিহ্ন করে ফেলে প্রেমতারার দুনিয়া। মরে যায় প্রেমতারা। মরে যেতে যেতে তবু বলে—না, না, না।

সামান্য সময়। তবু ঝড় এসে তাণ্ডব করে গিয়েছে—ভাঙাচোরা সর্বনাশ পড়ে আছে সামনে। তৃপ্ত একটা পাশব শক্তির মতো পড়ে

আছে গোপীনাথ। মুখটা একপাশে ঝুলে আছে যেন। প্রেমতারার ছিন্ন ভিন্ন বসন। হাতে, গালে, গলায় বড় বড় আঁচড়ের দাগ। মরে গিয়ে বেঁচে উঠেছে, তাই প্রেতলোকের হিংসা তার চোখে জ্বল্‌ছে। উঠতে গিয়ে পা কাঁপে। পাছে শব্দ হয় তাই হাঁটু ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে বেরোয় প্রেমতারা। তাকে মেরেছে দু'জন। মনোহর আর গোপীনাথ। গোপীনাথকে সে শেষ করে দেবে আজ। তারপর মনোহরের সঙ্গে মুকাবিলা করবে। কি দিয়ে কি করবে সে? মাথায় যেন আগুন লেগেছে। ভাবতে পারেনা প্রেমতারা। মনে হয় নিজের তাঁবুতে নতুন একটিন তেল জমা আছে। এনে ছড়া দিয়ে ঢেলে দিলে কেমন হয়? তাই ভালো। জ্বলন্ত তাঁবু পেরিয়ে আসবে গোপীনাথ? তো প্রেমতারার যে দেহটার পরে গোপীনাথের এত লোভ, সেই দেহটা নিয়ে প্রেমতারা গোপীর গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়বে। বেরুতে দেবেনা। বলবে—এসো মাস্টার দুজনে মরি।

হঠাৎ মাথায় ধাক্কা লাগে আর কার গরম নিঃশ্বাস পড়ে। নিচু, গভীর একটা গর্জন। তেমনি হামাগুড়ি দিয়েই মুখ তুলে তাকায় প্রেমতারা। বাদশা! হ্যাঁ বাদশাই তো! গোপীর নির্দেশে না বাদশার খাঁচা এখানে এনে রেখে গিয়েছে মনোহর? মোহবশে চেয়ে থাকে প্রেমতারা। বাদশার চোখের পিংলা তারা কেমন বড় দেখাচ্ছে আঁধারে। বাদশার খাঁচায় এবার মুখ রাখে প্রেমতারা। তার জীবনের এক চূড়ান্ত ক্ষণে, প্রথম দেখা হবে বাদশার সঙ্গে, তাও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। বাদশাকে এখানে এনেছে নিয়তি। তার মনোহরের দু'জনের জীবনে বাদশাই তো নিয়তি হয়ে বাদী হয়েছে কিনা! আজ তাই বাদশা থাবা মেরে ব'সে প্রেমতারার সর্বনাশ দেখছে। প্রেমতারা বলে—তুইও কি বেইমান? করতে পারিস্ না কিছু?—বাদশা মোটা ঘাড়টা তুলে ক্ষুব্ধ গর্জন করে! কি হয়েছে? মনোহরের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমতারাও না বাদশার কথা বুঝতে শিখেছিলো? কি হয়েছে বাদশার? হঠাৎ প্রেমতারা ক্ষিপ্র

হয়ে ওঠে। লাফিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর বেয়ে উঠে যায় খাঁচার ওপর। ঝপ করে খুলে ফেলে দরজা। বলে—কাম, বাদশা, কাম! কাম, বাদশা, কাম!

মানুষ নয়, নীল চোখ কোন বাঘিনী যেন। তাঁবুর দরজা খুলে ধরে প্রেমতারা। বলে—চার্জ, বাদশা, চার্জ!

এরিনা নয়। তবু বাদশা তামিল করে হুকুম। বিশাল শরীরটা তাঁবুর পরিসরে জায়গা পায় না। তবু লাফিয়ে পড়ে সামনে। গোপীর দেহে থাবা পড়ে। ঠেলে দিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে গোপী, আর গর্জে ওঠে বাদশা। এদিক ওদিক চেয়ে, মাস্টারের স্টীল চেইনের চাবুকটা তুলে নিয়ে বাদশাকে মারে প্রেমতারা। আঘাতে সহসা হতবুদ্ধি হয়ে রেগে যায় বাদশা। তারপর গোপীনাথ চীৎকার করে—কে আছ কোথায় ঘণ্টি দাও! ক্ষেপে গিয়েছে বাঘ।

গলা শুনিয়েই সর্বনাশ করে গোপী। এই গলা বাদশার শত্রু। এই গলা তাকে চাবুক মারে। বাদশা এই গলার মানুষকে মারতে চায় না। বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু গোপী তা বোঝে না। ভয়ে উন্মত্ত। গোপী তার রিভলবারটা হাতড়ায়। লোহার নলটা হাতে ঠেকে যেন। বালিশের তলায়ই তো ছিলো!

এ তাঁবু ও তাঁবুর ঘুম ভেঙে মানুষ ছুটে আসতে থাকে। কেউ কিছু বুঝতে পারে না। মনোহরের ঘুম ভাঙে বাদশার গর্জনে। মনোহর ছুটে আসতে না আসতে, মাঝ পথেই দুই হাত ছড়িয়ে ছুটতে ছুটতে আসে প্রেমতারা। আছড়ে পড়ে তার বুকে। বাঁ হাতে তাকে জাপটে ধরে মনোহর। বলে—বাদশা কেন ডাকে? কি করিছিস্ তারা?

—বাদশাকে খুলে দিইছি মাস্টারের ওপর।

—কি করিছিস্ সর্বনাশী?

—ও রইতে তোর আমার শান্তি নেই। চল্ মনোহর পালাই।

—পালাবি কি বলছিস্ তুই?

—বাদশা। বাদশা। ডাকতে ডাকতে আসে মনোহর। পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে নিয়ে আসে কেউ। আলোতে তাঁবুর দড়ি-দড়া, লণ্ডভণ্ড বিশৃঙ্খলা আর বাদশার খালি খাঁচাখানা চোখ পড়ে। মাস্টার আর বাদশা, একবার এ নিচে, একবার ও নিচে। দু'জনকে দিশা হয় না।—বাদশা। হিয়ার, কাম হিয়ার। বাদশা।

মনোহরের গলা শুনে বাদশা ঘাড় ফেরায়। আর গোপীনাথের ডান হাতটি বেরিয়ে আসে।

—মেরো না মাস্টার, মেরো না।

মনোহর দু'জনের মাঝেই এসে পড়তো বা। কিন্তু প্রেমতারা তাকে আসতে দেয় না। গলা ধরে ঝুলে পড়ে। বলে—মরুক ওরা। তুমি ওর মধ্যে যেও না। আর গোপীনাথ, যার বুকখানা চিরকাল ভয়ের পাঞ্জায় কয়েদী, সে আর বাদশা খোলা ময়দানে মুখোমুখী হয়। এ কথা গোপী একবারও ভাবে না, যে বাদশা তাকে তেমন আঘাত করেনি। ভয় পেয়ে হতবুদ্ধি হয়েছে বাদশা। আক্রমণ করবার সহজাত শিক্ষা ভুলে বাদশা খাঁচার আশ্রয়ে ফিরে যেতে চাইছে। গোপীর ঘর্মাক্ত হাত মুহূর্তেই বের করে রিভলভার, আর প্রেমতারার হাত ছাড়িয়ে মনোহর এসে পড়ে বাদশার নামটা বুক ফাটিয়ে ডেকে, কিন্তু গোপীনাথের গুলি তার আগেই যায় ছুটে। একবার নয়। দুইবার।

গর্জন। সোনালা কালো ডোরার একটা উৎক্ষেপ। তারপর সব শব্দ ডুবিয়ে একটা ঘড়ঘড় শব্দ হয়, আর বাদশার সুন্দর গর্বিত শরীরটা মাথা থেকে শুরু ক'রে ল্যাজের ডগা অবধি কেঁপে কেঁপে থেমে যায়। সেই শরীরের ওপরেই মনোহরও দুমড়ে মুচড়ে পড়ে মুখ থুবড়ে।

—এ কি করলে মাস্টার?

তার এ কথাটার যেমন কোন জবাব মেলেনা—তার বুকভাঙা কান্নাটার শব্দেও সার্কাসের মানুষের মাথা নিচু হয়ে আসে।

মুখ ঘষ্‌ড়ে, কেঁদে, তারপরে ওঠে মনোহর। গুলি-খাওয়া জন্তুর মতো নড়বড় ক'রে উঠে মনোহর এবার আঁধারের দিকে চলে যেতে থাকে। লোকজনের বেষ্টনী থেকে দূরে। মাঠের মধ্যিখানে। ঠাণ্ডায়, আঁধারে।

মাস্টারের মুখখানা থেকে নিজের দৃষ্টিটা ছিঁড়ে নিয়ে আঁচল উড়িয়ে সে দিকপানে ছুটে যায় প্রেমতারা।

বুকে-পিঠে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বসেছিলো গোপী। বিদায় নিতে এসে কাছে দাঁড়ালো প্রেমতারা। হিসেব-নিকেশ বোঝাবুঝি হয়ে গিয়েছে। লেনদেন বাকি নেই। প্রেমতারার হাতে সুটকেশটি।

সারা মুখে, বুকে, হাতে স্টিকিং-প্ল্যাস্টার আঁটা। তবু হাসতে লাগলো গোপীর চোখ মুখ। গোপী বললো—যাও তারা, সুখী হও।

প্রেমতারার বুকটি আজ মাস্টারের ক'রে কাঁদতে লাগলো। তবু হাসতে লাগলো প্রেমতারাও। বললো—তুমিও সুখী হয়ো মাস্টার। এমন একলাটি থেকোনি।

দশ বছরের পরিচয়। গোপীর কল্‌জেটি ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রেমতারা, সে কথা গোপী বলে না। এক রাতের ঝাপটায় ভয়ের খোলসটি খুলে ফেলে গোপী অন্য মানুষ হ'য়েছে। কিন্তু সে কথাও বলতে বসে না গোপী। গোপী শুধু হাসে। গোপী গোষ্টমাস্টারের শিষ্য, গোপী এ সার্কাসের বিধাতা। কত চোট তাকে আরো খেতে হবে, অমন কমজোরী কলজেটি কি তার খানদানে পোষায়? তাই গোপী হাসে। সার্কাসের মানুষ হাসি ছাড়া অন্য কথা জানে না। হাসতে হাসতেই বলে গোপী—কোথায় গেলে, কেমন রইলে, জানাবার জন্যে কিন্তু ব্যস্ত হয়ো না তারা—নিজের জীবনে সুখে থেকো। অন্য কিছু ভেবো না।

—না মাস্টার। ঝেখানে রইব, সুখে রইব।

প্রেমতারার সুখ দেখে গোপীর বুকখানাও যেন ভ'রে যায়।

বলে—শোনো তারা, পরে, অনেক পরে, যদি পারি তো যাব। দেখে আসবো তোমার সুখের সংসার, জানলে ? কিন্তু এখন নয়কো।

—বেশ তো মাস্টার!—ব'লে প্রেমতারাও হাসে। হাসে আর নীল চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ জল পড়ে। বলে—আসি মাস্টার। দোষের কথা মনে রেখো না।

—না।

চেয়ে থাকে গোপীনাথ।

শুধু কি মাস্টার ? যাবার কালে কেউ কাঁদে না, সবাই হাসে। শশী, চামেলী, রাজুক, মেরী, কিরণ, বিমল, টিয়া, চন্দনা, বাঁশী, কেষ্টবাবুর বৌ, কেষ্টবাবু, শিউলী। প্রেমতারার একটি হাত ধরে শিউলী হাসে, অন্য হাত ধরে চামেলী হাসে। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল পড়ে এই যা। সুকুলবাবুও আজ সকলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে আজ। শশী বলে—ঝগড়া তোলা রইলো তারা, পরে হবেখ'ন।

শশীর বুকে মাথাটি রেখে প্রেমতারা হাসি বিনা-ই চোখের জলে ধারা বইয়ে দেয়। বলে—শশীদাদা গো, যাবার কালেও ঝগড়ার কথা কইবে ?

—নিশ্চয়!—ব'লে শশী প্রেমতারার ফর্সা গাল মুছিয়ে দেয়। বলে—তোর সতীনের হিংসে হলো, ছাখ তারা।

—চামেলীদিদির সতীন হ'তে বয়ে গেছে আমার!—পুরোন রসিকতাটি ক'রে প্রেমতারা হাসে। তারপর চড়ে বসে রিক্শায়।

সবাই চেয়ে থাকে। যতক্ষণ না ধূলোটি মিলিয়ে যায় পথের বাঁকে। তারপর হাসতে হাসতে শশী চামেলীকে তুলে নিয়ে বোঁ ক'রে একচাকার সাইকেলে পাক খেয়ে এরিনায় চলে যায়। খাটো জাঙ্গিয়া আর আঁটো গেঞ্জী পরে ছুটতে ছুটতে সবাই চলে যায় এরিনায়।

তখন রাউটির সময় হয়েছে। ব্যাণ্ড প্র্যাক্টিস হচ্ছে। মেয়েরা

হাসতে হাসতে তারের ওপর নাচছে। নিচে ছেলেরা বারের খেলা দেখাচ্ছে। গ্যালারির ফাঁকে ফাঁকে বৌকে কাঁধে নিয়ে শশী সাইকেল চালাচ্ছে। তাঁবুর বাইরে শিউলীর তরুণ গলা শোনা যাচ্ছে—আপ বেগম আপ! ডাউন বেগম ডাউন! কপালে হাত রেখে জলভরা চোখে মাসী প্রেমতারাদের দিকে চেয়ে থাকে। আর শিউলীর গলা শোনে।

নতুন সার্কাস কুইনের কাছে খেলা শিখছে নতুন জানোয়ার!—যে মানুষ দুটো চলে গেল, তার কথা কি কেউ মনে রাখলো না? মাসীর বুড়ো গালে জল পড়ে আর মনে মনে জানে, না সবাই ভুলে যাবে না মনোহর ও প্রেমতারাকে। সার্কাসের মানুষ বুকের কোটরে তাদের ভালবাসাটি ধরে রাখবে। এদিকে তেমনিই বাজনা বাজবে। তেমনিই পোস্টার পড়বে, গাছের গায়ে, পাঁচিলে পাঁচিলে, শহরের দেয়ালে—।

এগিয়ে চলবে গোপীনাথের সার্কাস। একদিনের তরেও বন্ধ রইবে না।

॥ শেষ অধ্যায় ॥

গ্রেট জুবিলি সার্কাস ছেড়ে এসে মনোহর ও প্রেমতারা কিছুদিন ছিলো বর্ধনবাবুর সার্কাসে। তারপর, মাদ্রাজের এক পার্টির সঙ্গে হঠাৎ পাঁচবছরের কণ্ট্রাক্ট হ'লো। প্রেমতারা বললো—চল দেশ দেখে আসি গে' ঝাই।

মাদ্রাজ, বম্বে, সুরাট, রাজকোট, হায়দ্রাবাদ। সাতশো' টাকা মাসমাইনে-তে পাঁচবছরের জন্যে কবুল হবার কষ্ট হাড়ে হাড়ে বুঝলো প্রেমতারা। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই—আর্টিস্ট বা জীবজন্তু ব'ল মায়াদয়া নেই—চেট্টিয়ার ঝানু ব্যবসাদার। আরো কি, মানুষ ব'লে কারুকে রেয়াত করেনা চেট্টিয়ার। একমাসের ছেলে তাঁবুতে রেখে এসে মাদ্রাজী মেয়ে কনকাম্মা ট্রাপিজে ঝাঁপ খায়। ছুটি ব'লে বস্তু নেই। প্রেমতারার সঙ্গে বছর খানেকের মাথাতে-ই ঝগড়া বাধলো। ম্যানেজার রমণ বড় ভাল ছেলে। প্রেমতারাকে চটতে দেখলেই—সিস্টার, সিস্টার, ব'লে মানাতে চেষ্টা করে। সে অনেক বোঝালো। বললো—চেট্টিয়ার সার্কাস ব্যবসার মানুষ নয়। কাপড়ের দোকান ছিলো। এটার সম্পর্কে কিছু বোঝেনা। আরে, এ তো ফাট্‌কা নয়, যে হাতে হাতে লাভ পাবে। তুমি রাগ ক'রোনা সিস্টার! এসো তাস খেলি।

তাসের ম্যাজিক শেখায় রমণ। বলে—আমি সার্কাসে আছি তুই পুরুষ ধ'রে। মাই ফাদার গ্রেট্ লায়ন টেমার বেঙ্কট সিনিয়র। আমি এই সার্কাস ঠিক কিনে নেব, দেখ না।

এক একদিন প্রেমতারা রেগে যায়। বলে—মী নো সিস্টার। মী প্রেমতারা। মী নো হ্যাপি। মী গো এ্যাওয়ে।

ছাড়তে চাইলেই কি পারতো? চেট্টিয়ারের চালের ভুলে প্রেমতারা বেঁচে গেল। পার্টি নিয়ে মোটা কণ্ট্রাক্ট ক'রে মালয়ে

যাবার কথা হলো। প্রেমতারা লেখাপড়া জানে না, কিন্তু হিসেবটি রক্তে রক্তে। বললো—মালয় ইণ্ডিয়ার বাইরে। কণ্ট্রাক্ট ইণ্ডিয়ার জন্যে। আমি যাব না।

চেট্টিয়ার আর প্রেমতারা কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে খুব ঝগড়া করলো। প্রেমতারা হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জী প'রে চেট্টিয়ারকে তেড়ে তেড়ে গেল। শেষ অবধি প্রেমতারাকে ছেড়ে দিয়ে রেহাই পেল চেট্টিয়ার।

রমণ একটু দুঃখ পেল। কেননা ইদানীং প্রেমতারার প্রতি তার মনোভাবটা সিস্টারের চেয়ে অনেক রসঘন ব'লে বোধ হচ্ছিলো। সমুদ্রে, জাহাজে, বেশ একটু ঘনিষ্ঠ হবার কল্পনা-ও তার ছিলো। কেন না ইতিমধ্যেই সিস্টারকে সোনার একটা আংটি উপহার দিয়েছে সে। টাকা কটা বৃথাই গেল। প্রেমতারা তাই নিয়ে হেসে গড়িয়ে গেল। মনোহরকে বললো—ছোঁড়া বেশ মানুষটা গো।

তারপর বোম্বাইয়ে ঘুরতি ফিরতি হঠাৎ লালবাবুর সঙ্গে দেখা। এমন আশ্চর্য কাণ্ড-ও হয়! গ্রাণ্টরোডে ভাঙা লোহা লক্কড়ের দোকান দিয়ে ব'সে আছে লালবাবু। তবে না লালবাবু মরে যাবে? আর বাঁচবেনা? লালবাবু মনোহর আর প্রেমতারাকে দেখে কম আশ্চর্য হলোনা। প্যারেলে তার ঘরে নিয়ে গেল। তার মারাঠি বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। বলিষ্ঠ প্রৌঢ় বৌ। মিলে কাজ করা বৌ। মদ খেতে দেয় না লালবাবুকে। লোহার দোকানের হিসেব নেয় নিত্যি রাতে।

আসলে লালবাবুকে জীবনের নেশায় পেয়েছিলো! গ্রেট জুবিলী ছেড়ে এসে মনে হয়েছিলো যৌবনের পরিচিত বোম্বাই-এ ঘুরে গেলে কেমন হয়? জীবনটা কি একেবারেই বরবাদ? না কি ছেঁড়া সুতো আজ-ও পড়ে আছে কিছু এখানে সেখানে? তুলে নিয়ে জাল বোনা চলে কি?

মোহিনী আর আলবার্টের পরিচয়ের বোম্বাই আর তেমনটি নেই।

তবু লালবাবু সেখানেই খোঁজ পেলো চিম্মাবাঈ কুন্‌বীনের। আর আবার ফিরে বাঁচতে ইচ্ছে হলো।

মনোহরের দিকে চেয়ে চোখ কুঁচকে লালবাবু কি ভাবলো। তারপর বললো—তোমাদের দেখলে আবার যেন ঝুঁকি নিতে ইচ্ছে করে মনোহর। তবে কি জানো—আর পারবোনা।

সার্কাসের মানুষ ছাড়া কে এমন ক'রে ভাঙাচোরা জীবনটা কুড়িয়ে আবার বাঁচতে পারে ?

ঘুরে ফিরে যখন বাংলাদেশে ফিরলো মনোহর আর প্রেমতারা, তখনই প্রেমতারার খেলা পড়তে শুরু করেছে। আর ঐ বোম্বাই বাঙ্গালোর ঘুরতে-ই আর এক ব্যাপার লক্ষ্য করলো প্রেমতারা আর মনোহর। যুদ্ধ, দেশভাগ, নতুন স্বাধীনতা আর তার পরের টালমাটালের সব ক-টা চোট সামলে মাদ্রাজ থেকে রাশি রাশি সার্কাস পার্টি উঠছে। নতুন নতুন পার্টি। চমৎকার সব আর্টিস্ট। প্রেমতারা আর মনোহর যখন ফিরলো বাংলাদেশে, তখন সার্কাস জগতে জোর কম্পিটিশান।

এখন প্রেমতারার অনেক পয়সা হবার কথা, কিন্তু সার্কাস দুনিয়ার নিয়ম অনুযায়ী প্রেমতারার খেলা পড়তে শুরু করেছে। নির্মম ভাবে পড়ছে। বুকিং হলো 'বি' ক্লাস সার্কাসের সঙ্গে।

দেহ ভারী হয়েছে। ট্রাপিজ ঝাঁপাতে হাঁপ ধরে। যতদিন বা বড় পার্টি-তে ছিলো, খাওয়া দাওয়ার কত কড়াকড়ি ছিলো। ভাত খাবনা বেশী, দুপুরে ঘুমোবনা, মোটা হলে চলবেনা। শীতকালে দুধের সর মুখে মাখা চাই। গ্রীষ্মকালে চন্দন বাটা আর লেবুর রসে ফেটিয়ে মুখটি স্নিগ্ধ রাখার অভ্যাস। এখন ভরা তিরিশ বছর হ'তে সকল দিকেই ঢিলে পড়লো। মেটেবুরুজে বাসা। বন্ধু হলো জাহাজের খালাসী জুয়াড়ী-রা। তাদের মতো খাওয়াদাওয়ার অভ্যাস হলো। নোনাগাঙের মাছ সস্তা দরে কিনে পেঁয়াজ রসুন লঙ্কার ঝাল ক'রে না রাঁধলে মুখে রোচেনা। কাঁকড়া আর কচি কুমড়োর

ঝাল চচ্চড়িতেও আপত্তি নেই। তেলেভাজা আর মাংসের বড়াতে-ও দারুণ ঝোঁক। আরো লজ্জার কথা কি, আরো একটি নেশা ক'রে মরেছে প্রেমতারা। মেয়েছেলের কি সে নেশা করতে আছে? মনোহর বলে—আমি ব্যাটাছেলে আমার দোষ নেই কো'। তুই মেয়েছেলে, জানলি?

প্রেমতারা বলে—ধুৎতোর—আর খাব না। শীতলার কিরে খাচ্ছি—আর খাব না!

কিন্তু সন্ধ্যে হলেই যে গা হাত পা ভেঙে আসে! শরীরের জড় যেন ভাঙেনা! মা-শীতলাকে সওয়া পাঁচআনার পুজো পাঠিয়ে আবার বোতল নিয়ে বসে প্রেমতারা।

ডিম, মাংস, পড়তি আর্টিস্টের যম। গাঁটে গাঁটে বাত ধরলো প্রেমতারার। শরীর আর তেমন বাঁকে না।

সাইকেলের খেলাতে স্পীড প'ড়ে যায়। ম্যানেজার বলে——ভেরী ব্যাড। কন্ট্রাক্ট ক'রেই ভুল করিছি। তোমাকে দিয়ে চলবে না গো।

দু'দিন সাবধানে থাকে। মানকচুর রুটি খায়। গোবর লবন একসঙ্গে ফুটিয়ে আকন্দ পাতা দিয়ে পট্টি বাঁধে গোড়ালীতে। কবিরাজী ঔষধ খায়। কিন্তু যখন খালাসীরা ডাকতে আসে—চল দিদি আজ রাতে বোর্ড পাড়বো, গোমেজের মা মাংস রেঁধে আনবে 'খন। তখনই প্রেমতারা অসাবধান হয়। মাকড়শা প্যাটার্নের দুল হার পরে জুয়ো খেলতে যায় মনোহরের সঙ্গে। সিন্ধী ছেলে মনসুখানীর সঙ্গে টেক্কা দিয়ে জুয়োর কায়দা শেখে। রাত ভোর খেলা হয়। সকালে তাঁবুতে গিয়ে আর প্র্যাকটিস করতে পারেনা। ম্যানেজার বলে—ফের গাফিলতি করছো

নতুন রিংমাস্টার নির্মম ভাবে প্রেমতারাকে খাটায়। প্রেমতারা গালি দেয় মনে মনে আর খেলে। কিন্তু খেলা তার পড়ছে। তাতে তার নিজের-ও ভুল হয় না। জোয়ান চীনে মেয়ে চেরী আর রাণী

সুন্দরী, পরী-রা হাসে তাকে দেখে। বলে—মাসী, আর চলছে না গো। মেসোকে নিয়ে কেটে পড়ো। কেন আর পুরোন নাম ভাঙাচ্ছ ?

—আমি তোদের মাসী ? ভালখাগী-রা আমার বয়স দেখছিস ? আমার বয়স পঁচিশ, জানলি ?

—পঁচিশ বছর তোমার আর জন্মে হবে।

চেরীদের যৌবনের জোর। ঝগড়া করে পারে না প্রেমতারা। বাইরে চলে যায়। তুই কানে রিং, মুখে রং, মাথায় পালকের টুপি সার্কাসের লাল টিউনিক পরে বসে বসে অঝোরে কাঁদে প্রেমতারা। পড়তির সময়টা এমন নিষ্ঠুর ভাবে তাকে ঘা দিয়ে যাচ্ছে বয়সটা ? হায় গো, এমন হবে কে জানতো ?

এমনদিনে মনোহরকে ঘরে ফিরে সোয়াস্তিতে থাকতে দেয় না প্রেমতারা। খুঁচিয়ে ব্যস্ত করে তোলে। বলে—আয়নাটা আন্ তো দেখি ? মুখে মেছেতার দাগ পড়েছে না কি ? হেজলীন পমে-টম এনে দিস দিখিনি ?

মনোহর আয়না আনতে না আনতে প্রেমতারা আয়না রেখে দেয় বলে—বল্ এখনো আমি দেখতে ভাল রইছি তুই ভালবাসিস ? বল আমার পানা সোন্দরী তুই দেখিসনি কো ?

মনোহর বোঝে ক্ষেপেছে পাগলী। বুঝে বুকে সাপটে আদর করে। বলে—লাল কাপড়টি পরে এসে দাঁড়া দিখিনি ! মুণ্ডু ঘুরে যাবে না মানুষের ?

সে সবদিনে আবার একটু বল ভরসা পায় প্রেমতারা। ম্যানে-জারের বকুনি গায়ে লাগেনা তার। সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে মস্করা করে। বলে—ছোকরা তোমার বয়স কত ? তিরিশ ? কি দেখেছো তুমি সার্কাসের ? ইউ নো মী ? মী প্রেমতারা। মী সার্কাস কুঈন। মী ফ্লেম অফ্ নাইনটিন থার্টি নাইন। জানো ?

এ যুগের ছোকরা ম্যানেজার ছোটকলজেয় এতখানি প্রাণবন্ত

রঙ্গরস নিতে পারেনা। বলে—ঠিক আছে। কেমন এলেম বোঝা যাবে খ'ন! যাও দিখিনি।

প্রেমতারা চলে যায়। কিন্তু সেদিনই এরিনায় এমন একটা ভুল করে বসে, যে স্বয়ং এসে মালিক, শো-এর পরে তাকে গালাগালি করে ভূত ভাগায়। বলে—এই সীজন হলেই তোমাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো! রোজ ট্রাবল করছো!

জীবনে-ও এমন মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা হয়নি। ঘরে ফিরে সেদিন মনোহরের কাঁধে মাথা রেখে প্রেমতারা কাঁদে, কেবলই কাঁদে। মনোহর বলে—টাকা তো অনেক হলো তারা! এবার ছেড়ে দে না কেন!

ছেড়ে দেবে? এই জীবন ছাড়া আর কি জানে প্রেমতারা? এই সার্কাসের আকাশ ছাড়া অন্য আকাশে সে নীলিমা দেখেনা। এই সার্কাসের ধূলোর গন্ধভরা বাতাস ছাড়া সে নিঃশ্বাস নিতে পারে না তাই কামড়ে পড়ে থাকে প্রেমতারা।

আরো দু'বছর বাদে প্রেমতারাকে দেখা যায় একেবারে ছেঁড়া-কানাতের থার্ডক্লাস সার্কাসে। চড়কের মেলায় পচা তাঁবুতে ড্যাগার-কুঈন প্রেমতারা। গ্যাসের বাতি। পাঁপড়ের গন্ধ। মেলায় গরম। বুড়ো রোগা একটা বাঘকে খেলায় প্রেমতারা আর দুটো ট্যামটেমি বাজিয়ে দর্শক ডাকে মনোহর।

রাত ক'রে যখন ঘরে ফেরে প্রেমতারা আর মনোহর, তখন রাতটা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বাড়ছে। পথের পাশে ভিখিরীরা অব্‌ধি তাস পেতে বসেছে। প্রেমতারা ঘরে ফিরে দেখে তার ঘরে-ও বোর্ড পড়ে গিয়েছে। অপেক্ষা করছে জুয়ার আড্ডার সেথো-রা। প্রেমতারা পোশাক ছাড়েনা। বাঘছাল ছাপা স্কার্ট আর কালো বডিস্, পালক-তোলা টুপী আর কানে বড় বড় ঝুঁটো মুক্তোর দুল পরে বসে পড়ে। বলে—হাত দেখা মির্জা। দিকদারী করিসনা।

মির্জা হাত দেখায়। সুর্মা টানা চোখ মচ্‌কে বলে—মাসী সার্কাসটা ছেড়ে দাও। ঘরে তোমার টাঁকশাল।

রাতে মনোহর-ও সেই কথা বলে। বলে—ও আর চলবেনা। তুই ছাড় তারা।

—ছাড়বো!—বেশী কথা ভাঙেনা প্রেমতারা। আসলে সে পোস্টার দেখে এসেছে। গোপীর গ্রেটজুবিলি এসেছে হাওড়া ময়দানে। প্রেমতারা মনে মনে এঁচে রেখেছে, একলা সে চট্ করে হালচাল দেখে আসবে। যদি কথা বার্তা বলা সম্ভব হয়, তো ঐ সার্কাসেই ফিরে যোগ দেবে সে। প্রেমতারার মনে একটা অবোধ দুরাশা। হয় তো সে ফিরে একটা ঝিলিক দিতে-ও পারে। চমক্ লাগাতে-ও পারে। যদি সুযোগ পায়। যদি সুযোগ পায় তে একখানা চমক দিয়ে সে তবে ছাড়বে সার্কাস। মনোহরকে কোন কথা বলেনা।

কালীবাড়ী পুজো আর মানসিক দেবার ভাঁওতা দিয়ে এক গা গয়না পরে বেরিয়ে পড়ে প্রেমতারা। ঝলমলে সিল্কের শাড়ী। পায়ে জরির চটি মাথার চুলে রিবন বেঁধে প্রজাপতি খোঁপা বাঁধা। পাউডারের পরতে গলা বুক ঢাকা। সোনার মফচেনের নিচে কলজেটা ধুকপুক করে। না জানি কে কেমন আছে, কোথায় আছে। তার চেনাজানা সবাই আছে কি?

আজ প্রেমতারাকে এখানে কেউ চেনেনা। চোখ তীক্ষ্ণ করে একটা চেনামুখও চোখে পড়েনা প্রেমতারার। গোপীর তাঁবুটাই দেখিয়ে দেয় সকলে। সেদিকেই চলে প্রেমতারা। একজন বুড়ো মানুষ খাটিয়াতে বসে তেল মাখছে। তাকেই জিজ্ঞাসা করে প্রেমতারা মাস্টারের খবর। নামটি শুনে চমকে চায় মানুষ। আর বিস্ময় ও করুণায় প্রেমতারা বলে ওঠে—মাস্টার! তুমি?

—প্রেমতারা?

ব'লে কথা হারিয়ে চেয়ে থাকে গোপীনাথ। কাঁচাপাকা চুল। মুখে দাড়ি গোঁফ। সেই তেলপালিশ কালো মিসমিসে চুলের কেয়ারী আর মোম পালিশের গোঁফ কোথায় গেল? সেই ধবধবে রং আর

পাহাড়ের মতো শরীর-ই বা কি হয়েছে ? প্রেমতারার মনের কথাটি ধরে নেয় গোপীনাথ। বলে—তোমার বয়স-ও তো বসে নেই তারা! তবে হ্যাঁ, আমার চে' বয়সটা তো কম। বসো। বল কি খবর? এ্যাঁ? কি মনে করে এলে?

—এমনিই মাস্টার। ঘুরতে ফিরতে। বসে বটে প্রেমতারা। কিন্তু সহজ হতে পারেনা। আজ দু'জনাকে দেখে একথা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন হয়, যে কোনদিন-ও এই দুটি নরনারী বিচিত্র হৃদয়-আবেগের সংঘাতে পরস্পরের কাছে এসেছিল। একজন অপরকে কামনা করেছিল, আর একজন নিষ্ঠুর হয়ে সে কামনা প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলো। সেই টান কোথায় গেল? প্রেমতারার মধ্যে কি জাদু দেখেছিল গোপী? তাই বুঝি ভাবতে চেষ্টা করে চেয়ে চেয়ে। সেই চাহনিতে প্রেমতারার বুকের ভেতরটায় কোন একটা সাধের প্রাসাদ ভেঙে ভেঙে যায়। প্রেমতারা বোঝে গত জীবনের কোন প্রেম, কোন স্মৃতি-ই আর বেঁচে নেই। এখন তারা দু'জন একান্তই নিঃসম্পর্কের দুটি মানুষ। সত্যিটা এমন রূঢ় যে তাতেই প্রেমতারা নিজেকে কমজোরী বোধ করে। আরো কটা কথা বিনিময় হয়। কিন্তু সে কথায় কোন প্রাণ নেই। কষ্ট করে হেসে-ই উঠে পড়ে প্রেমতারা। বলে—যাই মাস্টার। দেখাশোনা ক'রে আসি গে', যাবার কালে আসবো 'খন!

—কার সঙ্গে দেখা করবে প্রেমতার? কেউ কি আছে তোমার জানা মানুষ?

—সে কি? মাসী, শশীদাদা, কেষ্টবাবু কেউ নেই?

—মাসী পেটের পাথুরী কাটাতে গে' মরে গেছে সেই কবে। শশী গেছে বর্ধনবাবুর সার্কাসে।

—কেষ্টবাবু?

চোখ ছোট ক'রে তাকায় গোপীনাথ। সন্দেহ পিটপিট করে চোখে। বলে—জেনে শুনে ভাঁড়াচ্ছ না তো?

প্রেমতারা মাথা নাড়ে। গোপী বলে—কেষ্ট বেইমানী করে ক্যাশ ভেঙে না পালিয়েছিল? এখন বুঝি শ্যালদ'তে দোকান দিয়েছে।

কেষ্টবাবু? গোপীর এত দিনের বন্ধু? গোপী বলে—মানুষ এমনি-ই হ্যাঃ।

অন্য কারু কথা নয়—মাসীর কথাটি মনে পড়ে। প্রেমতারার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে। প্রেমতারা বলে—কিরণ? বিমল? শিউলী?

—ও সব একঝাড়ের বাঁশ। যে যার মতো সরে ন'ড়ে গিয়েছে। এখন সব নতুন নতুন আর্টিস্ট।

সকালের রোদে ফুটোফাটা তাঁবুটা বড় কুশ্রী দেখায়। গোপীর সার্কাসে কেমন একটা মলিনতার ছাপ। চেহারাতে-ও যেন পড়তি সার্কাসের মালিকের ভাব সুস্পষ্ট।

কথা না কইলে-ও প্রেমতারার মনের ভাব বুঝতে দেরী হয়না গোপীর। বলে—দেখছ কি? আমি-ও চক্ষু বুঁজব আর সার্কাস-ও লাটে উঠবে। ঐ চন্ননা কি কিছু রাখবে ভেবেছ?

—কোন্ চন্ননা গো?

—কেন সুখেন বক্সীর পেয়ারী? বোনটা পালালো সুখেন মরতে! চন্ননা-কে বে' করলামনা আমি? সেই কাটিহারের পার্টিতে।

—জানিনা মাস্টার। ছিলুমনা আমি।

—ছিলেনা, তাই নয়?

কোন কথা-ই মনে জাগে না গোপীর। প্রেমতারা কবে চলে গেল, কেন চলে গেল, সে সব কথাই ধুয়েমুছে অকিঞ্চিৎকর হয়ে গিয়েছে গোপীর মনে। এমন হয়? প্রেমতারা একেবারে মিথ্যে হয়ে গিয়েছে গোপীর কাছে। সেই যৌবন আর সৌন্দর্যের আধার প্রেমতারা যাকে দেখলে গোপীর চোখে কামনা জ্বলে উঠতো, সেই সার্কাস কুঈন কবে মরে গিয়েছে। এখন গোপীর চোখ দিয়ে নিজেকেও যেন বোঝে প্রেমতারা? হ্যাঁ সার্কাসে কুঈনের সিংহাসন

টলে গিয়েছে। কবে-ই যে রাণীগিরি ফুরিয়ে গিয়েছে তা কি জানেনি প্রেমতারা? আর, সব জায়গা ছেড়ে এই গোপীমাস্টারের কাছে-ই বা কেন নিজেকে যাচাই করবার কামনা ছিলো তার? কেন মনে হয়েছিলো, এই একটা ঠাঁইয়ে সে ঠিক মর্যাদাটি পাবে? এমন ভুলও মানুষ করে? বিদায়ী যৌবনের দুঃখে প্রেমতারার বুক ফেটে কান্না নামে। তবে সে কান্নার জ্বালা আছে। জল নেই। তাই সে কান্না দেখতে পায়না গোপীনাথ। প্রেমতারার দিকে চেয়ে শুধু অসুবিধে বোধ করে। তারপর কি মনে করে বলে—কাজের জন্যে এয়েছো কি? কাজ বাপু এখন নেই! আমার এখন হাতভরা প্রেমতারা।

হায় হায় শেষকালে এই হলো অবস্থা? গোপী মনে করলো সে কাজের কাঙাল হয়ে এসেছে এখানে? মানুষের যৌবন গেলে কি মানুষ এমনিই ছোট হয়ে যায়? ঐ গোপীর মতো? প্রেমতারার চোখেমুখে পুরোন জেল্লা ঝলকে ওঠে। সে বলে—না মাস্টার। তুমি কাজ দিলেই যে আমি করবো, সে অবসর আমার কোথায়? অলিম্পিয়া কোম্পানী-র কণ্ট্রাকট রয়েছে না আমার? 'এ' ক্লাস সার্কাস। আর্টিসট-কে মাইনের ওপর বোনাস দেয়, জানো না? কাশীপুর বাগান থেকে এলো বলে পার্কসার্কাস ময়দানে। আজ-ও গোরাসায়েবের ব্যাণ্ডপার্টি পুষছে, চালাকি কথা নয়! দশটা হাতী, বিশটা উট, বাঘ সিংহ পনেরো-টা! আমি এয়েছিলুম দেখা সাক্ষাৎ করতে। তা চলি এবার!

এতক্ষণে পুরোন প্রেমতারাকে দেখে চমক খেয়ে তাকিয়ে থাকে গোপীনাথ। আর তার—চোখে পুরোন দিনের মতোই কোন তারিফ ঝল্কে ওঠে প্রত্যুত্তরে। আর যে শেষ চমকটা এরিনায় দেখাতে চেয়েছিলো প্রেমতারা, সেই রাণীগিরির চমকটায় গোপীনাথের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে উঠে পড়ে প্রেমতারা। দুজনে দুজনের দিকে ক্ষণিক চেয়ে থাকে। প্রেমতারার নাকের ডগা একটু একটু কাঁপে, আর গোপীনাথের মধ্যে তার সেই পুরোন কৈশোর যৌবনের সব

ঐতিহ্যটার মর্যাদা যেন পলকের তরে দেখা যায়। তারপর গোপীর চোখের সে আগুন নিভে যায়। আর তাকায় না প্রেমতারা। বোঝে গোপী-ও মরে গিয়েছে। আর ফিরে এলে শুধু ছাই আর আঙার-ই চোখমুখ কালো করে উড়বে। সে ছাই-এর তলে কোন আগুনের ছিটেফোঁটা ফুল্‌কি-ও নজরে পড়বে না।

বেরিয়ে আসে প্রেমতারা। হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে বাসে চড়ে আসতে আসতে গঙ্গার বাতাস লাগে। চিকচিকে নোনা জলে ভেজা গাল। তার ওপর বাতাস লেগে ঠাণ্ডা বোধ হয়। এই ভাল হলো! এবার সে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে আসতে পারে চিরতরে।

মনোহরকে নিয়ে সেদিন প্রেমতারা গঙ্গার ধারে বেড়াতে যায়। সাঁঝ পেরিয়ে যায়। বসেই থাকে। কি হয়েছে জানেনা মনোহব। বলে—সার্কাসে যাবিনি? সাঁঝ হলো যে!

ঝোড়ো বাতাসে কথাগুলো দূরের মতো শোনায়। প্রেমতারা বলে—ছেড়ে দিলাম রে। আর যাব না।

—সে কি প্রেমতারা?

—না মনোহর।

বুকের ভেতরে যে একটা জগৎ ভেঙে চূরে গিয়েছে আর সেই ভাঙা বসতের ওপরে দাঁড়িয়েই যে প্রেমতারা তাকে নতুন জীবনের ঘরবসতে আহ্বান করছে, তা তো বোঝেনা মনোহর। আঁধারে সে ঠাওর ক'রে প্রেমতারার চোখে শুধু প্রেমই দেখে। বুকভরা প্রেম, মমতা, ভালবাসা। প্রেমতারা বলে—কেন, ঘর বাঁধবনা আমরা? সময় হয়নি কো?

সময় হয়ে গিয়েছে। তাই ঘর বসতির জীবনেই চলে এলো প্রেমতারা। সার্কাসের মেয়ের সাধ কামনার শেষ আশ্রয়। এ ঘরে ব্যাণ্ডের বাজনায় মন উত্তাল করা আনন্দ নেই, দর্শক জনের চোখের সামনে স্বপ্নের পরী হয়ে শূন্যে দোল খাওয়া নেই, বাঘকে পোষ মানিয়ে সাম্রাজ্ঞীর মতো মহিমময়ী হওয়ার উত্তেজনা-ই

বা কোথায়? সেই দুনিয়াটিকে বুকের কোটরে রেখে, সে দুনিয়ার দরজাটি চিরতরে বন্ধ করে দিলো প্রেমতারা।

এখন খাঁচায় টিয়া-ময়না গান গাইবে, দড়ির ওপর কোঁচানো শাড়ী ঝুলবে, জল-চৌকিতে বাসনপাতি ঝকঝক করবে, গ্রামোফোনে প্রেমের গান বাজাবে। আর একটিমাত্র মানুষকে নিয়ে, ভালবেসে, হেসে-কেঁদে, তার মধ্যেই নতুন নতুন জগৎ খুঁজে পেতে হবে প্রেমতারাকে। হাজার রঙের বর্ণালী ছাড়া প্রেমতারা যখন বাঁচতেই পারে না, মানুষটাই যখন জমকালো চরিত্রের, তখন সে সব রঙ মনোহরকেই যোগাতে হবে। মনোহরের চোখের মধ্যেই প্রেমতারা বারবার বৈচিত্র্য, উত্তেজনা, আনন্দ আর মমতায় শিরশিরে সুখ, এই সব ফিরে ফিরে আবিষ্কার করবে। তাই ভাল হলো। তাই ভাল হলো।

ব্যাঙের ঝমেঝম্ বাজনা আর ভোররাতে রাউটি-র বাঁশী আর কোনদিন ভুলিয়ে নিয়ে যাবেনা সার্কাসের মেয়েকে। জীবনে বাঁচবার নিশানা পেয়ে গিয়েছে প্রেমতারা।

॥ সমাপ্ত ॥